প্রথম প্রকাশ ঃ আশ্বিন ১৩৬৭ । প্রকাশক ঃ জয়দেব ঘোষ । মডেল পাবলিশিং হাউস ২এ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট কলকাতা ৭৩ । মুদ্রক ঃ বাবাই পাপাই প্রেস ৩ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট কলকাতা ৭৩ ।

হেমিংওয়ের ছোটগল্প : ব্যক্তিত্বের অভিব্যক্তি

অভিজ্ঞতা বৈচিত্র ঘটনাবহুল জীবন যে কোন একজন লেখকের কাছে এক পরম সম্পদ। সে এই সমস্ত ঘটনা এবং অভিজ্ঞতাকে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে তাঁর লেখার মধ্যে এনে শান্তি পান। বর্ণনা সংলাপ অভিব্যক্তি—সবকিছুর মধ্যে লেখকের আর একটি সত্ত্বা প্রকাশ পায়। এবং এই প্রকাশ ভঙ্গির স্টাইল কায়দা এক একজন লেখককে করে তোলে বিখ্যাত। তিনিই তখন পাঠকদের কাছে প্রিয় লেখক।

আর্নেস্ট হেমিংওয়ের গদ্য লেখার রীতি এক বিশেষ ধরনের। তিনি শেষ দিন পর্যন্ত তাঁর এই লেখার ব্যাপারে বিশেষ ভাবে সচেতন ছিলেন। ভাল গদ্য লেখাছিল তাঁর সাধনা। তাঁর নিজস্ব গদ্যের স্টাইল পৌছে দিয়েছে বিশেষ জায়গায়। আপাতদৃষ্টিতে হেমিংওয়ের গদ্য খুব সহজ ও সরল কিন্তু তাঁর সমস্ত গদ্যই অন্তর্লীন কবিতায় আচ্ছন্ন। কাব্যময় পরিমণ্ডলের মধ্যে তাঁর লেখা ঘুরে ফিরে তৃপ্ত। হেমিংওয়ের বিশেষ ধরনের রচনাশৈলি সাহিত্যের এক অন্যতম সংযোজন।

মূলত হেমিংওয়ে একজন গল্পকার। তিনি গল্প লেখা দিয়েই তাঁর জীবন শুরু করেন। প্রথম প্রকাশিত বইয়ের নাম ইন আওয়ার টাইম। তাঁর প্রথম লেখা ছোটগল্পের সংকলন। তিনি বিভিন্ন পরীক্ষা নিরীক্ষার মধ্য দিয়ে ছোটগল্পের যে রূপ দিয়েছেন—এককথায় সত্যি তা অনবদ্য। সংবেদনশীল। অত্যন্ত স্মার্ট। সহজ এবং সাধারণ কথাবার্তা ছোটখাটো ঘটনা এবং চিন্তা ভাবনা সাজিয়ে এমন ভাবে গদ্য রচনা করা যেতে পারে - সত্যি এক বিরল ঘটনা।

হেমিংওয়ের লেখার মধ্যে বার বার ঘুরে ফিরে এসেছে তার অভিজ্ঞতার কথা। এক জীবনে তার বিভিন্ন ঘটনার বৈচিত্র তাকে ভীষণ ভাবে অভিজ্ঞ করে দিয়েছে। জীবন অতিবাহিত করার জন্য তিনি বিভিন্ন কাজে নিযুক্ত হয়েছিলেন। দেশে বিদেশে বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্ন স্তরে। নিজস্ব জীবনেও তিনি ছিলেন বৈচিত্রপূর্ণ। তিনি চার চারবার বিয়ে করে চারজন মহিলার সঙ্গে ঘর বেঁধেছিলেন।

কিন্তু তবু তিনি সুখী হতে পারেন নি বোধহয় তা না হলে আত্মহত্যা করবেন কেন? নাকি এ নির্মম অভিজ্ঞতাটাও তিনি পেতে চেয়েছিলেন বুঝতে চেয়েছিলেন মৃত্যুর স্বাদ। কেউ কেউ বলেন, আত্মহত্যা করা এক ধরনের মনের বিকার। রোগ। বংশানুক্রমিক এর ছায়া পড়ে। হেমিংওয়ের বাবাও আত্মহত্যা করেছিলেন। তখন ওঁর বয়স ছিল কম। ছোটবেলা তাই খুবই কষ্টের মধ্যে কাটাতে হয়। তিনি জীবনে প্রথম অর্থ উপার্জন করতে নামেন পত্রিকার সংবাদদাতা হিসেবে এসময় শুরু হয় প্রথম বিশ্বযুদ্ধ। যুদ্ধের অভিজ্ঞতা থেকেও তিনি বাদ পড়েন নি। ছেলেবেলায় এক দুর্ঘটনায় তার দৃষ্টিশক্তি ক্ষীণ হয়ে যাওয়ায় সরাসরি সৈন্যবাহিনীতে যোগ দিতে পারেননি কিন্তু রেডক্রশের অ্যাম্বুলেন্স চালক হিসেবে নিযুক্ত হতে পেরেছিলেন।

ছেলেবেলায় সুদক্ষ অ্যাথলেট হিসেবে হেমিংওয়ে নাম করেন। যুবক বয়েসে তিনি হয়েছিলেন একজন বিখ্যাত মুষ্টিযোদ্ধা। এছাড়াও তার উৎসাহ ছিল শিকারে। মাছধরায়। বুলফাইটিং এ। এক অদ্ভুত উত্তেজনাময় ঘটনায় সমৃদ্ধ হেমিংওয়ের জীবন। তিনি এ সমস্ত বিচিত্র অভিজ্ঞতাই তার বিভিন্ন লেখায় বার বার করে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে নিয়ে এসেছেন।

হেমিংওয়ে তার বহমান জীবনের অনুভূতি এবং প্রতীতিকে আহরণ করে নিজস্ব দর্শনে কিংবা আদর্শের অনুকূলে কাঙ্ক্ষিত সত্যকে আবিষ্কার করেন। তাই তার ছোটগল্প পড়তে যেয়ে ব্যক্তিত্বেরই পরিস্রুত রূপ দেখতে পাই। সেটি হেমিংওয়ের সত্তারই প্রতীক। তার সমস্ত লেখায় ছড়ানো রয়েছে এই ব্যক্তিত্বেরই অভিব্যক্তি।

: গল্পক্রম :

হেমিংওয়ের গল্প

ভাষান্তর : দেবব্রত মল্লিক

ইণ্ডিয়ান ক্যাম্প

হ্রদের উপকূলে অন্য একটি ছিপনৌকা এনে রাখা ছিল। সেখানে অপেক্ষা করছিল দুজন ইণ্ডিয়ান।

নিক এবং তার বাবা নৌকায় উঠে পেছন দিকে বসল। একজন ইণ্ডিয়ান পাড় থেকে নৌকাটাকে ঠেলে আনার সঙ্গে সঙ্গে অন্য আর একজন দাঁড়ে বসে টানতে শুরু করল। পাশেই অন্য একটি নৌকায় কাকা জর্জ। তিনিও বসে আছেন নৌকার পেছন দিকে। তরুণ ইণ্ডিয়ানটি জর্জ কাকার নৌকাটিও ঠেলে চলার সূচনা করে দিল।

অন্ধকারের মধ্যে চলতে শুরু করল দুটি নৌকা। নিকের মনে হল পাশের নৌকাটির দাঁড় আটকানো কিন্তু তবু নৌকাটি নিকদের নৌকা ছাড়িয়ে অন্ধকারের মধ্যে চলছে এগিয়ে। এদিকে ইণ্ডিয়ান দুজন ওদের নৌকার দাঁড় দ্রুত ফেলছে ছপ্ ছপ্। নিক বাবার শরীরে গা এলিয়ে চুপ করে বসে ছিল। জলের ওপর ঠাণ্ডা লাগছে। ইণ্ডিয়ানরা খুব পরিশ্রম করে ওদের নৌকার দাঁড় টানছে। কিন্তু অপর নৌকাটি সব সময়ই নিকদের নৌকা ছাড়িয়ে এগিয়ে চলেছে অন্ধকারের মধ্যে।

—আমরা কোথায় চলেছি বাবা? নিক প্রশ্ন করে।

—ইণ্ডিয়ান ক্যাম্পে। সেখানে এক ভদ্রমহিলা খুবই অসুস্থ।

—ওহ্। নিক উত্তর করল।

এরই মধ্যে অন্য নৌকাটি তীরে পেঁছে গেছে। জর্জ কাকা অন্ধকারে বসে সিগার খাচ্ছেন। ইণ্ডিয়ান দুজন জলে নেমে ওদের নৌকোটা টেনে পাড়ে তুলে নিল। জর্জ কাকা দুজন ইণ্ডিয়ানকে দুটো সিগার খেতে দিলেন।

এবার উপকূল দিয়ে হাঁটার পালা। এটা একটা ঘাস পথ। শিশির পড়ে সমস্ত পথটা

ভিজে আছে। একজন ইণ্ডিয়ানের হাতে লণ্ঠন সে আলো দিয়ে পথ দেখিয়ে নিয়ে চলেছে। কিছুটা পথ যাওয়ার পর সামনেই জঙ্গল। জঙ্গলের মধ্যে এখানে ওখানে সর্বত্র কাঠের গুড়ি ছড়ানো রয়েছে। তরুণ ইণ্ডিয়ানটি হঠাৎ করে থেমে পড়ল এবং হাওয়ায় তার হাতের লন্ঠনটি গেল নিভে। এরপর অন্ধকার পথ ধরে তারা আস্তে আস্তে এগিয়ে যেতে লাগলো।

কিছুটা সামনে এগিয়ে যাওয়ার পর বাঁক। একটা কুকুর বেরিয়ে এসে ঘেউ ঘেউ শুরু করেছে। এখান থেকে দূরে দেখা যাচ্ছে আলো। ছোট ছোট কুঠিরের আলো। এখানে কিছু ইণ্ডিয়ান আরক্ষী বাহিনী বাস করে। আরো অনেকগুলো কুকুর তাদের তাড়া করে এসেছিল। সেই ইণ্ডিয়ান দুজন কুকুরগুলোকে ফিরিয়ে ঘরে পাঠিয়ে দিল। রাস্তার কাছে প্রথম কুঠরিটার জানলা দিয়ে আলো দেখা যাচ্ছে। তার দরজায় একজন বৃদ্ধ লণ্ঠন নিয়ে অপেক্ষা করছিলেন। ঘরের মধ্যে কাঠের বাংকে একজন ইণ্ডিয়ান তরুণী শুয়ে আছে। সে গত দুদিন ধরে প্রসবের যন্ত্রণায় কাতর। ক্যাম্পের সমস্ত বৃদ্ধারা তরুণীটিকে সাহায্য করার জন্য ব্যস্ত। আর সমস্ত পুরুষরা একটু ওপরে পাহাড়ের রাস্তায় বসে অন্ধকারে প্রহর গুনছে আর ধূমপান করছে। সেখানে তরুণীটির যন্ত্রণার শব্দ পৌছচ্ছিল না।

ঘরে প্রবেশ করল নিক তার বাবা ইণ্ডিয়ান দুজন এবং কাকা জর্জ। ওদের দেখা মাত্র তরুণীটি যন্ত্রণায় চীৎকার করে উঠলো। সে শুয়ে আছে নিচের বাঙ্কে মোটা তোষকের ওপর। তার মাথা ঘুরে একদিকে হয়ে আছে। ওপরের বাঙ্কে তরুণীটির স্বামী। তিন দিন আগে সে কুড়োল দিয়ে তার পা খুব খারাপ ভাবে কেটে ফেলেছে। সে বাঙ্কে শুয়ে শুয়ে ধূমপান করছিল। ঘরের মধ্যে একটা বিশ্রী গন্ধ।

নিকের বাবা ঘরে ঢোকার সঙ্গে সঙ্গে কিছু জল গরম করার আদেশ দিল। ষ্টোভে জল গরম হচ্ছে যখন, বাবা বললেন, জান নিক, এই তরুণীটি একটি শিশু প্রসব করবে।

—আমি জানি। নিক জানালো।

—তুমি ঠিক জান না, বাবা উত্তর দিলেন। এই যে তরুণীটি ছটফট করছে ওর অস্বাভাবিক ব্যথা হচ্ছে, একে বলে প্রসব বেদনা। এখন শিশু জন্ম নিতে চাইছে আর মা তাকে জন্ম দিতে চাইছে। তার দেহের সমস্ত তন্ত্রী দিয়ে শিশুকে প্রসব করাতে চাইছে।

—তাই-ই; নিক জানালো।

ঠিক তার পরমুহূর্তে তরুণীটি যন্ত্রণায় আর্তনাদ করে উঠলো।

—বাবা, ওকে কিছু একটা এমন ওষুধ দাওনা যাতে ওর যন্ত্রণায় লাঘব হয়?

—না যন্ত্রনা লাঘব করার মত তেমন কোন ওষুধ আনিনি।

বাবা জানালেন, এই সময় ঐ যন্ত্রণা তেমন মারাত্মক কিছু নয়।

উপরের বাঙ্কে শোয়া তরুণীটির স্বামী ঘুরে দেওয়ালের দিকে মুখ করে শুলো।

রান্না ঘর থেকে মেয়েরা ছুটে এসে ডাক্তারকে জানালো জল গরম হয়ে গেছে। ডাক্তার বাবু রান্না ঘরে ঢুকে কেটলির প্রায় অর্ধেক জল গামলায় ঢাললেন তারপর তার মধ্যে রুমালে জড়িয়ে আনা যন্ত্রগুলো ওর মধ্যে দিয়ে দিলেন।

—এগুলো সব জলে ভাল ভাবে ফোটানো প্রয়োজন। এরপর বাবা সাবানের টুকরো বার করে তা দিয়ে হাত দুটো ভাল করে ধুয়ে নিতে শুরু করলো। নিক বাবার হাত ধোয়া থেকে সবকিছু ভাল ভাবে খেয়াল করছে।

হাত ধুতে ধুতে বাবা নিককে আবার বলতে শুরু করলেন, তুমি জান নিক, শিশু যখন জন্ম গ্রহণ করে ওর মাথাটা প্রথম বেরিয়ে আসে। আবার কখনো উল্টোটাও হয় তখনই যত গোলমাল দেখা দেয়। আমার মনে হচ্ছে স্ত্রীলোকটিকে অপারেশন করতে হবে। আর অল্প কিছুক্ষণের মধ্যে তা বোঝা যাবে।

ভাল ভাবে হাত ধুয়ে পরিষ্কার করে বাবা ঘরের ভেতর কাজের জন্য ঢুকলেন।

—তোষকটা ভাল করে টেনে নাও'ত জর্জ? তুমি পারবে? ডাক্তার বললেন, আমার ওতে হাত না দেওয়াই ভাল।

কিছুক্ষণ পর সত্যি সত্যি ডাক্তারবাবুকে অপারেশন করতে হল। সেই সময় ঘরে ছিল তিনজন ইণ্ডিয়ান এবং জর্জ কাকা। নিক দাঁড়িয়েছিল বেসিনের কাছে। অনেক সময় ধরে চলেছিল অপারেশন।

আরো বেশ কিছুক্ষণ পর বাবা নবজাত শিশুটাকে হাতে তুলে নিয়ে ঝাঁকি দিল নিশ্বাস প্রশ্বাস চালু হওয়ার জন্য। তারপর শিশুটিকে একজন বৃদ্ধার হাতে তুলে দিতে যেয়ে নিককে বলল, দেখছ, নবজাত শিশুটি ছেলে? এতক্ষণ ঘরে বন্দী হয়ে থাকতে কেমন লাগছে?

নিক বাবা কি করছে সেদিকে না তাকিয়ে উত্তর করল, মন্দ না।

—ঐ যে, যা গেল, এই বলে বাবা বেসিনের ওপর কি যেন রাখলেন।

নিক তবু সেদিকে তাকালো না।

বেসিন থেকে ফিরে এসে বাবা জানালেন, আর কয়েকটা সেলাই করা বাকি আছে। আমি কাজটা সেরে আসি। নিক তুমি ইচ্ছে করলে দেখতে পার আবার নাও দেখতে পার। তোমার যা খুশি।

নিক ওসব দেখতে চাইল না। কেননা ওর ঔৎসুক্য অনেক আগেই চলে গেছে।

অল্প কিছুক্ষণের মধ্যে কাজ শেষ হয়ে গেল। বাবা উঠে দাঁড়ালেন। সঙ্গে সঙ্গে জর্জকাকাও এবং অপর তিনজন ইণ্ডিয়ান। নিক বেসিনটা তুলে নিয়ে এসে রান্না ঘরে রাখলো। জর্জকাকা নিজের হাতের দিকে তাকালেন। তরুণ ইণ্ডিয়ানটির মুখ এখন হাসি হাসি।

—আমি কিছুটা পারঅক্সাইড ওর মধ্যে দিয়ে দেব জর্জ? ডাক্তার বললেন।

সন্তানের জননী বিছানার ওপর এখন ক্লান্ত হয়ে শুয়ে আছে। ওর চোখ দুটো বোজা। মুখটা কেমন যেন শুকনো শুকনো লাগছে। অথচ নিজে কিছুই জানতে পারলো

না, ওর সন্তান কি হয়েছে কেমন আছে ইত্যাদি।

—ভোর হলেই আমি ফিরে যাবো। ডাক্তার বাবু বললেন, এর পর থেকে এখানে যেন একজন নার্স থাকে।

বাবাকে দেখে নিকের মনে হচ্ছে, বাবা যেন একজন খেলোয়াড়। খেলা শেষে ড্রেসিং রুমে এসে নিজেই এখন স্বতস্ফূর্ত।

জর্জকাকা দেয়ালের পাশে দাঁড়িয়ে মাঝে মাঝে তার হাতের দিকে তাকাচ্ছেন।

—সত্যি ডাক্তার তোমার তুলনা হয় না।

ঠিক এ কথার উত্তর না দিয়ে ডাক্তার প্রসঙ্গ পাল্টে বললেন, আমাদের গর্বিত পিতাকে দেখা দরকার। এই ছোট্ট ঘটনায় ওরা সবচেয়ে বেশি বিব্রত। আমাকে এটা বলতেই হবে এত সব ঘটনা হওয়া সত্ত্বেও সে খুব সহজভাবে এসব কিছু সহ্য করে নিয়েছে।

এই কথা বলার পর ডাক্তার বাঙ্কের ওপর শোয়া ইণ্ডিয়ানের মাথার নিচ থেকে কম্বলটা টেনে নিল। একি হাতটা কেমন ভেজা ভেজা লাগছে কেন? তিনি কম্বলটা নিচের বাঙ্কের কোণায় রেখে আলো নিয়ে দেখতে চেষ্টা করলেন। ইণ্ডিয়ানের মাথাটা তখনো দেয়ালের দিকে ঘোরানো। কিন্তু তার গলাটা কেটে পড়ে আছে এধারের কান থেকে ওধারের কান পর্যন্ত। সম্পূর্ণ বাঙ্ক জুড়ে রক্তের স্রোত। ওর মাথাটা বসানো রয়েছে বাঁ হাতের ওপর। তার সামনে কম্বলের ওপর পড়ে রয়েছে খোলা ধারালো ক্ষুর।

—নিককে ঘরের বাইরে নিয়ে যাও জর্জ। ডাক্তার জানালেন।

তার অবশ্য কোন দরকার নেই। কেননা নিক রান্না ঘরের দরজার সামনে দাঁড়িয়ে থাকলেও সবকিছুই দেখতে পেয়েছে। বাবা উঠে লণ্ঠনের আলো ধরায় বাঙ্কের ওপরের সবকিছুই দেখা যাচ্ছিল। বাবা ওপরে উঠলেন এবং ইণ্ডিয়ানের মাথাখানি ঘুরিয়ে ধরলেন।

এখন সবে দিনের আলো দেখা যেতে লাগলো। ওরা কাঠের গুঁড়ি ছড়ানো পথ ধরে ফিরে এলো হ্রদের দিকে।

—আমি তোমাকে সঙ্গে নিয়ে আসার জন্য সত্যি দুঃখিত। বাবা নিককে বললেন। ভাল ভাবে অপারেশন করতে পাবার আনন্দ এখন আর লাগছে না। এ সবের মধ্যে তোমাকে না নিয়ে এলেই ভাল হত।

—আচ্ছা বাবা সব মেয়েদেরই কি শিশু প্রসব করার সময় এরকম দুর্ভোগ ভুগতে হয়? নিক প্রশ্ন করে।

—না, এটা কখনো কখনো আকস্মিক ঘটে।

—বাবা ঐ ভদ্রলোক নিজেকে কেন ওভাবে হত্যা করলেন?

—আমি বলতে পারবো না নিক। তবে আমার মনে হয় ভদ্রলোক বোধহয় নিজেকে সংযত রাখতে পারছিল না।

—আচ্ছা বাবা, এই ভাবে অনেক পুরুষ মানুষই কি নিজেকে হত্যা করে ফেলে ?
—না, তেমন বেশি করে না নিক।
—মেয়েরা ?
—কখনো সখনো
—তারা কখনোই করে না ?
—তা কেন করবে না। কখনো সখনো করে বৈকি ?
—বাবা
—বল।
—জর্জকাকা কোথায় গেলেন ?
—ও সময় মত ফিরে আসবে।
—মৃত্যু কি খুব কঠিন, বাবা ?
—না, আমার মনে হয় খুব সহজ এবং সুন্দর নিক। তবে এ সমস্ত কিছুই নির্ভর করে তুমি কি ভাবে গ্রহণ করবে। তারা নৌকায় এসে বসলো। নিক বসলো পেছনের দিকে। বাবা নৌকা বাইতে শুরু করলেন। সূর্য পাহাড়ের চূড়া ডিঙিয়ে ক্রমশ ওপরের দিকে উঠে আসছে। হ্রদের জলে কি একটা জিনিষ পড়ার সঙ্গে সঙ্গে বৃত্তের আকার নিল জল। নিক হাত লম্বা করে জল ছুঁলো। ভোরের হাড় কাঁপানো ঠাণ্ডায় জলটাকে অনেক উষ্ণ মনে হচ্ছে।
এখন এই ভোরে হ্রদের জলে নৌকায় বাবার সঙ্গে বসে নিক নিশ্চিন্ত হয়ে ভাবলো, ও কোনদিনই মারা যাবে না।

দি রেভোলিউসনিস্ট

ইটালীতে সে ১৯১৯ খ্রীষ্টাব্দে রেল লাইনের পথ ধরে হাঁটছিল। তার সঙ্গে ছিল একটুকরো কাপড়। সে এটি পেয়েছিল পার্টির প্রধান কার্যালয় থেকে। তারপর পেন্সিল দিয়ে স্থায়ী ভাবে লেখা ছিল কমরেডদের প্রতি নির্দেশ ঃ যারা বুদাপেস্টে সাদাদের কাছে নির্যাতিত—তাদের মুক্তহস্তে দান করুন। সে টিকিটের পরিবর্তে এই নির্দেশ ব্যবহার করেছিল। লাজুক প্রকৃতির এই তরুণ ট্রেনের যাত্রীদের কাছ থেকে তেমন ভাল ব্যবহার পাচ্ছিল না। সঙ্গে টাকা না থাকার জন্য ওকে বসতে হয়েছিল একদম পেছনে।

কিন্তু ইটালী শহরে নেমে সে দারুণ খুশি। সত্যি এটা একটা সুন্দর রমণীয় জায়গা মনে মনে সে বলল কথাগুলো। এখানকার মানুষজন সব দয়ালু। সে প্রচুর শহর ঘুরেছে! হেঁটেছে আরো বেশি। ছবি দেখেছে অনেক। সে কিনেছে গিয়ট্টো ম্যাসাসিও এবং পিরো ডেল্লা ফ্র্যানসিসকার ছবি। সবগুলো জড়িয়ে রেখেছিল অভান্তির মধ্যে। ম্যানটেগনা ওর মোটেও পছন্দ নয়।

সে এসে বোলগনায় তার পেঁছি সংবাদ দিলে আমি ওকে নিয়ে রোমগনায় এসেছিলাম যেখানে আমার একজনের সঙ্গে দেখা করার জন্য যাওয়া প্রয়োজন ছিল। আমাদের দুজনে মিলে এই পথ পরিক্রমা—খুবই—উপভোগ্য হয়েছিল। সময় সেপ্টেম্বর মাসের প্রথম দিক। চারদিকে মনোরম দৃশ্য।

ভারি সুন্দর তরুণ। লাজুক স্বভাব। হরথিসের মানুষজনরা ওর কিছু ক্ষতি করেছিল। এ ব্যাপারে ও জানিয়েছিল কিছু কথা। তার বিশ্বাস পৃথিবীতে ক্ষুধার পরিবর্তে একটি জিনিসই বর্তমান—তা হচ্ছে বিপ্লব।

—ইটালীতে কি ধরনের আন্দোলন চলছে এখন? সে জিজ্ঞেস করল।

আমি উত্তর দিলাম, খুব খারাপ।
—কিন্তু ভাল যাবে। সে আবার বলতে শুরু করল, তোমাদের এখানে সবকিছু আছে। এটাই বোধহয় একমাত্র দেশ যেখানে সবাই নিশ্চিন্ত। এবং সম্ভবত সবকিছু শুরু হওয়ার কেন্দ্রবিন্দু এখানেই।
আমি চুপ করে রইলাম।
বোলগনায় এসে সে আমাদের সবইকে বিদায় জানাল। সে এখন প্রথমে যাবে মিলানো তারপর অন্টা ওখান থেকে গিরিখাত দিয়ে হেঁটে সে পৌছবে সুইজারল্যান্ডে।
মিলানোর মানটেগনা সম্পর্কে ওকে জানালাম।
খুব লজ্জিত ভাবে সে জানালো, না, সে মানটেগ না পছন্দ করে না।
আমি ওর সঙ্গে চিঠি লিখে দিলাম কমরেডদের ঠিকানা দিয়ে। খাওয়া থাকার জন্য সম্ভাব্য জায়গা। সে আমাকে ধন্যবাদ জানাল। আমি বুঝতে পারছিলাম ওর মন পড়ে রয়েছে অন্যত্র। সেই গিরিখাত। লম্বা টানা হাঁটা পথ দিয়ে সে যেতে চায়। সে গিরিখাতের সুন্দর আবহাওয়ার মধ্যে দিয়ে হেঁট যাবে। তার ভীষণ প্রিয় শরতের পাহাড়।
শেষ পর্যন্ত ওর কথা যা শুনেছিলাম তা হচ্ছে, সিওনের কাছা কাছি এক কারাগারে সুইসরা ওকে বন্দী করে রেখেছে।

হিলস লাইক হোয়াইট এ্যালিফ্যাণ্ট

এব্রো উপত্যকার ওপর দিয়ে আড়াআড়ি হয়ে লম্বা চলে গেছে পাহাড়। এর রং সাদা। এ পাশে কোন ছায়া পড়ে না। কোন গাছ নেই। দুটো লাইনের মাঝখানে আছে ষ্টেশন। ষ্টেশনের কাছাকাছি বাড়ির উষ্ণ ছায়া। খোলা দরজার সামনে ঝোলানো রয়েছে বাঁশের তৈরী জালি, মাছি যেন না ঢুকতে পারে। বাড়ির বাইরে সেই ছায়ায় টেবিলের দুপাশে বসে আছে একজন আমেরিকান ও একটি মেয়ে। আজ বেশ গরম। বারসিলোনা থেকে এক্সপ্রেস ট্রেন চল্লিশ মিনিটের মধ্যে এসে হাজির হবে। এই জংশনে দু মিনিটের জন্য দাঁড়িয়ে তারপর রওনা হবে মাদ্রিদের দিকে।

—আমরা কি খাবো? মেয়েটি জানতে চাইল। মাথা থেকে টুপিটি খুলে রাখলো টেবিলের ওপর।

—আচ্ছা বিয়ার খাওয়া যাক।

বাঁশের জালের দিকে মুখ রেখে পুরুষটি বলল, বিয়ার দাও।

—বড় বোতল? ভেতর থেকে পরিচারিকা জানতে চাইল।

—হ্যাঁ, দুটো বড় দাও।

পরিচারিকাটি দু পাত্তর বিয়ার এনে টেবিলে প্যাডের ওপর রাখলো। টেবিলে দুটো রেখে সে একবার মেয়েটির দিকে এবং ছেলেটির দিকে তাকালো। মেয়েটি সেই মুহূর্তে তাকিয়ে দেখছিল দূরের পর্বত শ্রেণী। সূর্যের আলো পড়ে সব সাদা লাগছে আর সব কিছু মনে হচ্ছে যেন ধূসর এবং শুকনো।

—দেখ দেখ ঐ গুলোকে দেখতে কিরকম সাদা হাতীর মত মনে হচ্ছে। মেয়েটি উচ্ছ্বসিত।

—আমি এরকম একটিও দেখিনি। গ্লাসে চুমুক দিল ছেলেটি।

—না, তোমার সম্ভবত দেখা হয়নি।
—আমি দেখেও থাকতে পারি। ছেলেটি জানালো, যেহেতু তুমি বললে আমি দেখিনি, তার মানে এই নয় যে আমি দেখিনি।
মেয়েটি ঘাড় ফিরিয়ে বাশের ঝালরের দিকে তাকালো। ঐ দিকে তাকিয়ে বলল, সুন্দর এঁকেছে ওর ওপর। এর মানে কি গো?
—অ্যানিস্ ডেল টরো। এক ধরণের ড্রিংক।
—আমরা একবার খেয়ে দেখবো?
ছেলেটি ডাকলো শোন। ভেতর থেকে সেই পরিচারিকাটি বেরিয়ে এসে দাঁড়ালো।
—চার রিল।
—আমরা দুটো অ্যানিস্ ডেল টরো চাই।
—জল দিয়ে দেবো?
—এই তুমি জল দিয়ে খাবে?
—আমি জানি না, মেয়েটি বলল। এটা জল মিশিয়ে খাওয়া ভাল?
—হ্যাঁ ঠিক আছে।
—তোমরা তাহলে জল দিয়ে খাবে। পরিচারিকা মহিলা জিজ্ঞেস করল।
—হ্যাঁ জল দিয়েই দাও।
মেয়েটি গ্লাসটা উপুড় করে রেখে বলল, এর স্বাদ অনেকটা যষ্ঠি মধুর মত।
—এই রকমই সবকিছু।
—হ্যাঁ, মেয়েটি জানালো। সব কিছুর স্বাদ যষ্ঠিমধুর মত। বিশেষ করে তুমি যে জিনিসের জন্য অপেক্ষা করে থাকবে।
—ছাড়, ওসব বাজে কথা।
—তুমিইত শুরু করলে। মেয়েটি হাসতে হাসতে বলল, আমার বেশ মজা লাগছে।
—বেশ, আমাদেরও ভাল সময়ের জন্য চেষ্টা করতে হবে।
—ঠিক আছে। আমি 'ত সে চেষ্টাই করছি। আমি পাহাড়কে তাই বলছিলাম সাদা হাতির মত। দেখতে কিরকম উজ্জ্বল, তাই না?
—সত্যি উজ্জ্বল।
—আমি এখন এই নতুন ড্রিংকের স্বাদ পেতে চাই। দেখ, এবং স্বাদ নাও।
—আমারও সেই মত।
মেয়েটি আবার পর্বতমালার দিকে তাকালো।
—ভারি সুন্দর পর্বতমালা। মেয়েটি আনন্দে উদ্বেলিত। ওটা সত্যিকারের সাদা হাতির মত দেখতে নয়। আমি গাছের ফাঁক দিয়ে ওরকম রঙ দেখে নামকরণ করছিলাম।
—আমরা আর এক গ্লাস করে নেবো?
—নাও।

গরম হাওয়া বইছে। ওপাশে হাওয়ায় দুলছে বাঁশের ঝালর।
—বিয়ারটা বেশ সুন্দর এবং ঠাণ্ডা। ছেলেটি বলল।
মেয়েটিও বলল, খুব সুন্দর।
—এটা একটা অতি সাধারণ অপারেশন, জিগ। ছেলেটি বোঝালো, এটাকে মোটেও অপারেশন বলা চলে না।
মেয়েটির দৃষ্টি টেবিলের পায়ের দিকে।
—আমি জানি এ নিয়ে তুমি বেশি কিছু ভাববে না জিগ। এটা মোটে ও কিছু না। শুধু মাত্র হাওয়াকে ভেতরে ঢুকতে দেওয়া।
মেয়েটি কোন কথা না বলে চুপ করে বসে রইল।
—আমি তোমার সঙ্গে যাবো। থাকবো সব সময়। তারা তোমার শরীরে একটু হাওয়া ঢোকাবে। ব্যাস তাহালেই তোমার সব ঠিক হয়ে যাবে।
—এর পর আমরা কি করবো ?
—এর পর আমাদের আর কোন চিন্তা থাকবে না। আমরা পূর্বাবস্থায় ফিরে যাবো।
—তোমাকে ওরকম চিন্তিত দেখাচ্ছে কেন ?
—ঐ টাই'ত একমাত্র যা আমাদের বিব্রত করছে। এর জন্যই আমরা আরো অসুখি।
মেয়েটি বাঁশের ঝালরে হাত দিল। তারপর আঙুল দিয়ে ঝালরের দুটো সরু কাঠি চেপে ধরল।
—তুমি বলছ এরপর আমাদের কোন চিন্তা থাকবে না, আমরা সুখী হয়ে থাকতে পারবো ?
—নিশ্চয়ই। তোমাকে ওরকম দুশ্চিন্তা করতে হবে না। আমি এরকম অনেককে জানি যারা এখন ভাল আছে।
—তাহলে আমিও করাবো। মেয়েটি জানালো। এবং তারপর অন্য সবার মত সুখী থাকবো।
—ভাল, ছেলেটি বলল, তুমি যদি না চাও তাহলে তোমায় কিছু করতে হবে না। আমি জোড় করে তোমায় কিছু করাতে চাই না। কিন্তু এটা বলতে পারি—এতে কোন রকমের গণ্ডগোল নেই।
—তুমি তাহলে সত্যি সত্যি চাও ?
—আমার মনে হয় এটা করাই ভাল। তবে তুমি না চাইলে সেটা আমারও চাওয়া নয়।
—এবং আমি যদি করাই তাহলে তুমি খুশি। তুমি আমাকে ভালবাসবে।
—আমি তোমাকে এখনো ভালবাসি।
—আমি জানি। আমি যদি করাই তাহলে ভাল এবং যদি বলি সবকিছু সাদা হাতির মত—তাহলে তুমি খুশি।
—আমি নিশ্চয়ই খুব খুশি। কিন্তু তুমি'ত জানই দুশ্চিন্তা হলে……

—আমি করিয়ে নিলে তোমার আর কোন দুশ্চিন্তা থাকবে না।
—সে জন্য আমার মোটেও দুশ্চিন্তা নেই। কেননা ওটা সাধারণ ব্যাপার।
—তাহলে আমি নিশ্চয়ই রাজী। কেননা আমি নিজের কথা মোটেও ভাবি না।
—তার মানে ?
—আমি তোমাকে নিয়ে একটুও ভাবি না ?
—ভাল, কিন্তু আমার তোমাকে নিয়ে ভাবনা হয়।
—হ্যাঁ তা'ত হবেই। আমি করিয়ে নেব তাহলে সবকিছু সুন্দর হয়ে যাবে।
—তুমি যদি ওভাবে ভাবো তাহলে আমি চাইনা তোমায় কিছু করিয়ে নিতে।
মেয়েটি এবার উঠে দাঁড়ালো, হেঁটে চলে এল স্টেশনের শেষপ্রান্তে। অপর দিকে সবুজ মাঠ, গাছপালায় ভরা এব্রো নদীর তীর। কিছুদূরে নদীর ওধারে সারি সারি পর্বত। ওপর দিয়ে মেঘ উড়ে যায়। তার ছায়া পড়ে জলে পাহাড়ে সবুজ ঘাসে। মেয়েটি গাছের ফাঁক দিকে তাকিয়ে রইল জলের দিকে।
—এবং আমরা এই সবকিছু পেতে থাকবো। মেয়েটি বলতে থাকে, আমরা এই ভাবে প্রতিদিন সবকিছু পেতে থাকলে—নিজেদেরকেই অসম্ভব করে তুলবো।
—কি বললে ?
—আমি বললাম, আমরা সবকিছুই পেতে পারি।
—নিশ্চয়ই পেতে পারি।
—না, আমরা পারি না।
—আমরা ইচ্ছে করলে সম্পূর্ণ পৃথিবীটা আমাদের করে পেতে পারি।
—না, আমরা পারি না।
—আমরা সর্বত্র যেতে পারি।
—না, আমরা পারি না। এটা মোটেও আর আমাদের নেই।
—এটা আমাদেরই।
—না, কখখোনো না। একবার যদি তারা নিয়ে চলে যায়, তাহলে আর ফিরে পাবে না।
—কিন্তু তারা এখনো নিয়ে যায় নি।
—আমরা অপেক্ষা করবো। দেখি কি হয়।
—এস আমরা পেছনে যেয়ে ছায়ায় দাঁড়াই। ছেলেটি বলল, তুমি ওভাবে কখনো ভেবো না।
—আমি সেভাবে কিছুই ভাবি না। মেয়েটি জানালো, আমি শুধু জানতে চাই।
—তুমি যা ভালবাসো না—তা তুমি কর এটা আমি চাই না।
—শুধু তাই নয়, আমার পক্ষে ভালও নয়। মেয়েটি বলল, আমি জানি। চল আর একবার বিয়ার খাই।
—ঠিক আছে। কিন্তু তোমাকে বুঝতে হবে।

—আমি বুঝতে পারি। মেয়েটি জানায়, আমরা কিছুক্ষণ কথা বন্ধ রাখতে পারি ?
তারা দুজনেই ফিরে এসে টেবিলে মুখোমুখি বসল। মেয়েটির দৃষ্টি পাহাড়ের চূড়ায় উপত্যকার শুকনো দিকে। ছেলেটি লক্ষ করছিল মেয়েটির মুখ।
—তোমাকে বুঝতে হবে। ছেলেটির বক্তব্য, তোমার অনিচ্ছার বিরুদ্ধে কোন কাজ কর, এ আমি চাই না। তোমার বিন্দুমাত্র কিছু মনে হয়, তার জন্য আমি যে কোন ধরনের কাজের মধ্যে যেতে প্রস্তুত।
—এ ব্যাপার তোমাকে কিছু মনে করিয়ে দিচ্ছে না ? আমরা দুজনেই এক সঙ্গে চলি।
—নিশ্চই মনে করিয়ে দিচ্ছে। কিন্তু আমি তোমাকে ছাড়া আর কিছু ভাবতে পারি না। এবং আর কাউকে চাই না। আমি জানি এটা খুবই সহজ ও সরল।
—হ্যাঁ তুমি জান এটা খুবই সহজ।
—তোমার পক্ষে বলা খুব সহজ, আমিও জানি।
—তুমি কি এখন আমার জন্য কিছু করবে ?
—আমি তোমার জন্য সব কিছু করতে পারি ?
—তুমি কি দয়া করে দয়া করে দয়া করে দয়া করে তোমার কথা থামাবে ?
ছেলেটি কোন কথা না বলে ষ্টেশনের পাশে রাখা ব্যাগগুলোর দিকে তাকালো। ব্যাগগুলোর ওপর লাগানো রয়েছে লেবেল। এই লেবেলগুলো বিভিন্ন হোটেলের যে সমস্ত হোটেলে ওরা রাত কাটিয়েছিল।
ছেলেটি বলল, আমি ও সমস্ত কিছু ভ্রূক্ষেপ করি না।
—আমি চীৎকার করে উঠবো, মেয়েটি উত্তেজিত।
বারের ভেতর থেকে পরিচারিকাটি এসে দু গ্লাস বিয়ার রেখে গেল আর বলে গেল, পাঁচ মিনিটের মধ্যে ট্রেন আসছে।
—ওকি বলে গেল ? মেয়েটি জিজ্ঞেস করলো।
-ট্রেন পাঁচ মিনিটের মধ্যে চলে আসছে।
মেয়েটি পরিচারিকার দিকে তাকিয়ে খুশির হাসি হাসলো।
—আমি বরং ষ্টেশনের ওধারে ব্যাগগুলো রেখে আসি। ছেলেটি উঠে দাঁড়ালো। মেয়েটি হাসলো ওর দিকে তাকিয়ে।
—ঠিক আছে। রেখে এসো এরপর বিয়ার খেয়ে নোবা।
ছেলেটি ব্যাগগুলো তুলে অন্য ধারে রাখতে গেল। দারুণ ভারী ব্যাগগুলো। ওখানে দাঁড়িয়ে দূরে তাকালো ও। ট্রেন এখনো দেখা যাচ্ছে না। ফিরে এসে, বারের মধ্য দিয়ে হেঁটে এল জস্। সবাই এখানে ট্রেন আসার জন্য অপেক্ষা করছে। তারপর সে বাঁশের ঝালর ঠেলে বেরিয়ে এল বাইরে।
মেয়েটি টেবিলে বসে অপেক্ষা করছে। ওকে দেখামাত্র হেসে দিল।
—তোমার এখন ভাল লাগছে ? ছেলেটি জিজ্ঞেস করলো।
সে উত্তর দিল, আমার কিছুই হয়নি। আমি খুব ভাল আছি।

ক্যাট ইন দি রেইন

দুজন আমেরিকান হোটেলে আটকে গিয়েছিল। তারা তাদের রুমে যাওয়া এবং আসার সময় যাদের দেখেছে—প্রত্যেকেই অচেনা। তাদের থাকার রুম তিন তলায় ছিল। সমুদ্রের দিকে মুখ। তা ছাড়াও ঘরের সামনে আছে সাধারণদের জন্য বাগান এবং যুদ্ধের স্তম্ভ। বড় বড় পাম গাছ ও সবুজ বেঞ্চিগুলো বাগানের শোভা। ভাল আবহাওয়া সব সময়ই একজন শিল্পীকে দেখা যায় এখানে সে ইজেলের ওপর ছবি আঁকতে থাকে। পাম গাছের সারি হোটেলের উজ্জ্বল রং এবং সমুদ্র—শিল্পীর দারুণ পছন্দ। ইটালীয়ানরা বহুদূর থেকে আসে এখানে যুদ্ধ স্তম্ভটা দেখার জন্য। স্তম্ভটি ব্রোঞ্জের তৈরী বৃষ্টির জলে চকচক করে ওঠে। এখন বৃষ্টি হচ্ছে। পাম গাছ থেকে চুইয়ে চুইয়ে জল পড়ছে। বাগানে পাথর ছড়ানো পথে জলে দাঁড়িয়ে গেল। বৃষ্টিতে সামনের সমুদ্রকে মোটেও আর লম্বা লাগছিল না। যুদ্ধ স্তম্ভের চত্বরের কাছ থেকে মোটর গাড়িগুলো চলে গেছে। একজন পরিচালক ফের দরজার কাছে দাঁড়িয়ে শূন্য চত্বরটার দিকে তাকিয়ে আছে।

একজন আমেরিকান মহিলা জানালার কাছে তার দৃষ্টি বাইরের দিকে। বাইরে ঠিক জানলার নিচে একটা বেড়াল সবুজ বেঞ্চির তলায় গুটি শুটি হয়ে এমন ভাবে বসে আছে যেন ওর শরীরে জল না পড়ে।

—এই আমি নিচে নেমে বেড়ালটাকে নিয়ে আসি, আমেরিকান মহিলা বলল।

—আমি যাচ্ছি। তার স্বামী বিছানা থেকে জানালো।

—না, আমিই যাই। বেচারা বেড়ালটা বেঞ্চির তলায় জড়সড় হয়ে বসে আছে জলের ভয়ে।

দুটো বালিশ পায়ের তলায় ভাল করে দিয়ে স্বামী ভদ্রলোক পড়ায় মন দিলেন।

স্ত্রী ঘর থেকে বেরোনর সময় মনে করিয়ে দিলেন, ভিজো না যেন ?
স্ত্রী সিঁড়ি থেকে তর তর করে নিচে নেমে গেল। হোটেলের মালিক নিচে অফিস ঘরে ওর ডেস্কে বসেছিল। ভদ্রমহিলা কাছাকাছি আসতেই মালিক নমস্কার জানালো। অফিস ঘরে ওর ডেস্কটি একদম পেছনে। দেয়ালের ধার ঘেষে। বয়স হয়েছে। কিন্তু বিরাট লম্বা চওড়া চেহারা।
—কেমন আছেন ভদ্রমহিলা বলল, হোটেলের মালিকের রুচি তার পছন্দ।
—ভাল, ভাল, সিনোরা,। খুব বাজে আবহাওয়া।
আবছা ঘরের আলোতে ডেস্কের পেছনে উঠে দাঁড়ালো হোটেলের মালিক। ভদ্র মহিলা ওকে পছন্দ করেন। পছন্দ করেন মালিকের আপ্যায়ন। তাছাড়াও মালিকের রাশভারি চেহারা লম্বা হাত এবং সুডোল মুখ ভদ্রমহিলার দারুণ পছন্দ। ভদ্রমহিলা দরজার কাছে এসে দরজা খুললো। তাকালো বাইরের দিকে।
বাইরে অঝোরে বৃষ্টি হয়ে চলেছে। একজন রাবারের টুপি মাথায় শূন্য চত্বরের ওপর দিয়ে হেটে কাফের দিকে চলে গেল। বেড়ালটা নিশ্চয়ই ডানদিকে কোথাও হবে। ছাদের আলসের তলা দিয়ে ঠিক চলে যাবে, ও ভিজবেনা। এই সমস্ত ভেবে যেই সে দরজার কাছে এসে দাঁড়ালো, একজন পরিচারিকা তার পেছনে এসে ছাতা খুলে ধরলো।
—আপনি যেন ভিজে না যান। পরিচারিকাটি ইটালি ভাষায় কথা বলে, হেসে দিল। অবশ্য ওকে পাঠিয়েছে হোটেলের মালিক।
ওরা দুজনে নামলো পথে, পরিচারিকাটি হাতে ছাতা ধরে আছে। দুজনে পাথরের পথ ধরে ওদের জানলার নিচে এগিয়ে যেতে লাগলো। ওমা! বেড়ালটা কোথায় ? শুধু মাত্র সেই সবুজ বেঞ্চিটা পড়ে আছে। বৃষ্টির জলে ধুয়ে যাচ্ছে বেঞ্চির রঙের ঔজ্জ্বল্য। বেড়ালটিকে না দেখতে পেয়ে ভদ্রমহিলা ভীষণ ভাবে মনমরা হয়ে পড়লো। পরিচারিকাটি তাকালো মুখের দিকে।
—এখানে একটা বেড়াল ছিল ? আমেরিকান মহিলাটি হতভম্ব।
—একটা বেড়াল ?
—সি্ ইল গাট্টো
—একটা বেড়াল ? পরিচারিকাটি হেসে উঠল, বৃষ্টির মধ্যে বেড়াল ?
—হ্যাঁ, সে বলল, এই'ত টেবিলের নিচে ছিল। ইস বেড়ালটা যদি পেতাম, কি শখ ছিল আমার ?
যখন আমেরিকান মহিলা ইংরিজীতে কথা বলছিল, পরিচারিকাটির মুখের অবস্থা হয়ে উঠছিল কঠিন।
—চল সিনোরা, সে বলল, আমরা ভেতরে যাই চলে। তা না হলে ভিজে যাবো।
—আমার ও তাই মনে হয়। আমেরিকান মহিলার একই মত।
সেই পাথরের পথ ধরে তারা ফিরে এল। দরজা খুলে প্রথমে ঢুকে পড়ল ভদ্রমহিলা।

পরিচারিকাটি দরজায় বাইরে দাঁড়িয়ে ছাতা বন্ধ করে নিল। অফিস ঘরের সামনে দিয়ে যাওয়ার সময়, ঘরের ভেতর থেকে ডেস্কে বসে হেসে মাথা নোয়ালো মালিক। কয়েকটা মুহূর্ত মাত্র। খুবই ছোট ব্যাপার কিন্তু মহিলার মনে হচ্ছিল যেন অনেক কিছু। অনেক বড় ব্যাপার। কিছুক্ষণের জন্য ওর চলার গতি শ্লথ হয়েছিল কিন্তু তার পরক্ষণেই সিঁড়ি দিয়ে ছুটে ওপরে উঠে এসেছিল সে। তারপর সোজা একদম নিজেদের রুমে।

জর্জ সেই ভাবেই বিছানায় বসে বই পড়ছিল।

—বেড়ালটা ধরতে পারলে? বইটি নামিয়ে সে জিজ্ঞেস করলো।

—ধ্যাৎ, কখন চলে গেছে।

—আশ্চর্য, বেড়ালটা কোথায় যেতে পারে! পড়া থামিয়ে জর্জ বলল। সে ততক্ষণে বিছানায় বসে পড়ে।

—ইস্ আমার কি ইচ্ছে ছিল বিড়ালটা নিয়ে আসবো। স্ত্রীর মুখ অবসাদে ভরা। জানি না কেন ওকে পাওয়ার জন্য মনটা আমার উতলা। বৃষ্টির মধ্যে বেড়ালটা বেরিয়ে গেল এটা মোটেও মজার কথা নয়।

জর্জ আবার পড়তে শুরু করলো।

এরপর স্ত্রী ওখান থেকে উঠে গিয়ে ড্রেসিং টেবিলের সামনে এসে বসলো। সে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে আয়নায় নিজের দেহটা নিখুঁত করে দেখতে লাগল। শেষে মাথার চুল এবং গলা।

—এই দ্যাখ দ্যাখ আমার চুলগুলো যদি বড় হতে দিই তাহলে ভাল হয়, না? স্বামীর দিকে তাকিয়ে আবার আয়নায় নিজের প্রোফাইলের দিকে তাকালো।

জর্জ তাকালো, স্ত্রীর চুল এবং গলার দিকে তারপর বললো, ছেলেদের মত ছোট করে রাখাই ভাল। যেমন আছে এখন।

—আমার আর এ ভাল লাগে না। কি কেবল ছেলে ছেলে দেখতে।

জর্জ বিছানায় একটু সরে বসে স্ত্রীর দিকে তাকালো।

—তুমি ক্রমশ সুন্দরী হচ্ছ। জর্জ গার্বিত।

সে আয়নাটা নিচের দিকে নামিয়ে খোলা জানালার কাছে এসে বাইরে তাকালো। এখন ক্রমশ অন্ধকার লাগছে।

—আমি কি চাই জান? আমার চুলগুলো লম্বা হবে। মসৃণ চুলে আলতো করে খোঁপা বাঁধবো। সে বলতে থাকে আর চাই একটা বেড়াল। ওকে কোলে নিয়ে বসে থাকবো। মাঝে মাঝে খোঁচা দিলে ও গর্ গর্ করে আওয়াজ তুলবে।

—আচ্ছা। জর্জ বিছানা থেকে জানালো।

ও বলতে থাকে, আমি চাই টেবিলে বসে রুপোর বাসনে খেতে এবং আমার থাকবে ক্যান্ডেল। আমি উচ্ছল হতে চাই। আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে লম্বা লম্বা চুলে ব্রাশ করবো। আমার বেড়াল চাই আর কিছু নতুন কাপড়।

—চুপ করবে। আমাকে বই পড়তে দাও! জর্জ চীৎকার করে ওঠে। তারপর আবার বই পড়তে শুরু করে।

স্ত্রী জানালা দিয়ে বাইরে দূরে তাকিয়ে রইলো। এখন আরো বেশি অন্ধকার হয়েছে চারিদিক। পামগাছের ওপর অঝোরে বৃষ্টি হয়ে চলেছে।

—যাই হোক, আমি একটা বেড়াল চাই। সে বলতে থাকে, আমি একটা বেড়াল চাই, এখনই আমি একটা বেড়াল চাই। যদি আমি লম্বা চুল না রাখতে পারি কিংবা অন্য কোন মজা, তাহলে বেড়াল আমার চাই'ই।

জর্জ এসব কোন কথাই শুনছিল না। সে তার বই পড়ে চলেছিল। তার স্ত্রীর দৃষ্টি বাইরে গোল চত্বরটার দিকে। সেখানে একটা আলো জ্বলছিল।

কে যেন দরজায় টোকা মারছে।

—অবন্তী, জর্জ ডাকল। সে তার বই থেকে মুখ তুলে তাকালো।

দরজার সামনে দাঁড়িয়ে আছে পরিচারিকা। ওর কোলে কচ্ছপের খোলার মত একটা বিরাট বেড়াল। শরীরের সঙ্গে দুলছে।

—মাপ করবেন, সে বলল, মালিক সিনোরার জন্য এই বেড়ালটি আনতে বললেন।

ক্রস কানট্রি স্নো

ফুনিকুলার গাড়িটা আর একবারের মত নড়েচড়ে উঠে থেমে গেল। একটুও এগুতে পারলো না। চাক চাক বরফ ওপর থেকে নিচে এসে পড়ছে। পাহাড়ের চূড়ার বরফগুলো ক্রমশ বাতাসের দাপটে ভেঙ্গে ভেঙ্গে পড়ছে। নিক ওর স্কীতে মোম মাখাছে গাড়িতে বসে। তার পায়ের বুট দিয়ে ঠেলে বন্ধ করে ক্ল্যাম্প দিয়ে টাইট করে নিচ্ছে। সে গাড়ি থেকে বার হয়ে এক লাফ মেরে নিচে পড়ল। পড়ার সঙ্গে সঙ্গে পাক খেয়েছিল এইং দ্রুত গড়ানের মধ্যে পড়ে নেমে গিয়েছিল নিচে।

ঐ সাদার নিচে জর্জ একবার ডুবছিল আর একবার ভাসছিল, তারপর দৃষ্টির বাইরে চলে গেল। দ্রুত এবং হঠাৎ পড়ে যাওয়া পাহাড় থেকে খাড়াই ভাবে নিকের মন চঞ্চলিত ওড়ার আনন্দে, আবার তার শরীরে নামার রোমাঞ্চ। সে যেই কিছুটা ওপরে এসেছিল—বরফ পড়তে শুরু করেছে ওর নিচে। তারপর যখন ও নিচে নামতে শুরু করেছে এবং নামছে, দ্রুত এবং আরো দ্রুত হঠাৎ দেখে বিরাট লম্বা খাড়াই। এইভাবে গুটিসুটি মেরে ও ওর স্কীর ওপর বসে ছিল। মাধ্যাকর্ষণ শক্তি যাতে নিচের দিকে হয় সে চেষ্টা করছিল। বালির ঝড়ের মত বরফের ঝড় বইছিল। অল্প সময়ের মধ্যে সমস্ত পাহাড়ে তোলপাড়। তার স্কী ওপরে উঠে আটকে গেল আর তার নাক মুখ তখন সর্বত্র বরফে ভরা।

জর্জ ওখান থেকে কিছুটা নিচে ঢালুতে দাঁড়িয়েছিল। ওর হাওয়া জ্যাকেট থেকে বরফের টুকরো থেকে থেকেই পড়ছে।

—তুমি সুন্দর নিয়েছ, মাইক, সে নিককে বলল, সেই সুন্দর নরম তুষার। আমাকেও এইভাবে ভরে রেখেছিল।

—ওপরে ওটা কি? নিক স্কীটা পা দিয়ে লাথি মেরে পেছনে ফেলে দাঁড়ালো।

—তোমার বাঁ দিকটা খেয়াল রাখতে হবে। বেড়া থাকার দরুন দ্রুত নেমে যাওয়া ভাল।

—এক সেকেন্ড, আমরা একসঙ্গে নিয়ে নেবো।

—না, তুমি প্রথমে এস এবং যাও। আমি দেখতে চাই তুমি খাদ নিয়েছ।

—নিক অ্যাডম ওপর উঠে এসেছে। চওড়া পিঠ, বিরাট মাথা, এখনো কিছু কিছু তুষার লেগে আছে। তারপর ওর স্কী নিচে নামতে শুরু করল। ভীষণ দ্রুত। দ্রুত উঠা নামার জন্য স্কী থেকে একটা হিস হিস শব্দ হচ্ছিল। পাশ থেকে তুষার ছুটছিল পেছন দিকে। তার বাঁ পাশে জায়গা রাখা ছিল। যতই সে সীমানার কাছাকাছি আসছিল হাঁটু দিয়ে গতি রোধ করছিল। সীমানা ধরে ছিল তার কাঁটার বেড়া।

সে পর্বতের ওপরের দিকে তাকালো। জর্জ নিচের দিকে নেমে আসছে। হাঁটু গেড়ে, একটা পা সামনে বাঁকা হয়ে এবং অন্য পা হিঁচড়ে আসছে। ওর লাঠিটা ঝুলছিল পতঙ্গের সরু পায়ের মত। বরফের ওপর দিয়ে ওর হাঁটু গেড়ে হিঁচড়ে আসার পথটা একটা সুন্দর বাঁক নিয়ে ছবির মত মনে হচ্ছে।

—আমি খ্রীষ্টিকে ভয় পাচ্ছিলাম। জর্জ বলল, বরফগুলো ভীষণ গভীর তুমি সুন্দর করে রেখেছো।

—আমি আমার পা দিয়ে চিহ্নিত করতে পারিনি। নিক জানায়। নিক তার কাঁটার বেড়ার পাশ থেকে স্কী নিয়ে নেমে এল রাস্তায়। জর্জ নেমে এল পিছনে। নিক ওকে অনুসরণ করতে লাগলো। দুজনেই তৃষ্ণার্ত পথ হাঁটছে পাইন বনের মধ্য দিয়ে। পথের কোথাও কোথাও বরফ, পচা কমলা এবং হলুদ তামাক পাতার মত হিচড়ানো কাঠের গুড়ি। পথের দুধারে পর্যন্ত বরফ ছড়ানো স্কী খেলার জন্য। এই পথটা সোজা নেমে গেছে জলধারায় তারপর উঠে গেছে পর্বতের ওপর। পথ দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে ওরা দেখতে পেল লম্বা নিচু গুহা। রং চটা বাড়ি। প্রায় জ্বলে যাওয়া হলুদ রঙ হয়ে গেছে। জানালার ফ্রেমের কাঁচগুলো সবুজ রঙ করা। তাও চটে আছে। নিক তার স্কীর লাঠি দিয়ে ক্ল্যাম্প আলগা করে নিল তারপর লাথি দিয়ে সরিয়ে দিল স্কী।

—আমরা এগুলো এখান থেকে বইয়ে নিয়ে যেতে পারবো, সে বলল। খাড়াই পথ বেয়ে কাঁধে স্কী নিয়ে উঠতে লাগলো। গোড়ালির পেরেক বসিয়ে বরফের ওপর দিয়ে। সে শুনতে পাচ্ছে জর্জের নিশ্বাস পড়ছে। সেও তার গোড়ালি দিয়ে লাথি মেরে উঠছে তার পেছন পেছন। হোটেলে দুজনেই দুজনার স্কী নামিয়ে রাখল। ট্রাউজারের বরফ ঝেড়ে নিল। তারপর বুট পরিস্কার করে সোজা ঢুকে পড়ল ভেতরে।

হোটেলের ভেতরে এখন বেশ অন্ধকার। একটা বড় পোরসিলিনের স্টোভ রয়েছে ঘরের কোণায়। ঘরের উচ্চতা কম। দু ধারের দেয়াল জুড়ে রয়েছে দুখানা লম্বা

বেঞ্চ। দুজন সুইস বেঞ্চির ওপর বসে আর স্টোভের সামনে রয়েছে নতুন মদ। স্টোভের অন্যধারে ছেলেরা জ্যাকেট খুলে দেয়ালের ধার ঘেঁষে বসল। পাশের ঘরে কে একজন গান গাইছিল, থেমে গেল। নীল এপ্রোন পরা একটি মেয়ে দরজা দিয়ে ঢুকে এসে জানতে চাইলে ওরা কি ড্রিংক করতে চায়।

—এক বোতল সিওন, নিক বলল, এটা ঠিক আছে'ত গিজ ?

—নিশ্চয়ই, জর্জ জানালো। মদের ব্যাপারে তুমি অনেক অভিজ্ঞ। আমার যে কোন একটা হলেই চলে।

মেয়েটি চলে গেল।

—স্কী ইং এর মত আর কিছু হয় না, তাই না ? নিক বলল।

—হা ! জর্জ উচ্ছ্বসিত। এর কোন জুড়ি নেই।

মেয়েটি মদ নিয়ে এল। কিন্তু মুসকিল হয়েছিল কর্ক খোলা নিয়ে। শেষ পর্যন্ত অবশ্য নিক খুলতে পেরেছিল। মেয়েটি ঘর থেকে বেরিয়ে গেলে ওরা শুনতে পেল ওর গান। পাশের ঘরে জার্মান ভাষায় ও গান গাইছে।

—অ্যা ! কর্ক ভেঙে টুকরোগুলো এর মধ্যে পড়ে গেল ? যাকগে ওতে কিছু হবে না নিক হাসলো।

—মেয়েটির কাছে কোন কেক আছে কি ?

—দেখা যাক।

মেয়েটি আবার এঘরে এলে নিক খেয়াল করলো এপ্রোন দিয়ে ওর উঁচু পেটটা ঢাকা। ও অন্তসত্ত্বা। নিক মনে মনে ভাবলো প্রথমবার যখন ও ঘরে ঢুকলো মেয়েটির এ অবস্থা খেয়াল করিনি'ত ?

– তুমি কি গান গাইছিলে ? নিক প্রশ্ন করলো।

—অপেরা, জার্মান অপেরার গান। মেয়েটি এ বিষয়ে আর আলোচনা করতে চাইল না। শুধু জানালো আমাদের কিছু আপেলের স্টারুডেল আছে যদি চাও দিতে পারি।

—মেয়েটি কিন্তু সহৃদয়া নয়, তাই না ? জর্জ বলল।

—ঠিক তা হয়তো না। মেয়েটি আমাদের পরিচিত নয়, তার উপর ওর গানে মুগ্ধ হয়েছি এবং সে ওপরের অঞ্চলের অধিবাসী, সেখানে সম্ভবত ওরা জার্মান ভাষায় কথা বলে। তাছাড়াও ওর পেটে বাচ্চা আসছে। অথচ ওর বিয়ে হয়নি। এই সমস্ত কারণেই হয়তো বিভ্রান্ত।

—তুমি কি করে বুঝলে ও বিবাহিত নয়।

—হাতে কোন আংটি নেই। এখানকার মেয়েরা অত তাড়াতাড়ি বিবাহিত হয় না। বাইরের দরজাটা খুলে গেল। একদল কাঠুরে ওপর থেকে নেমে এসে হোটেলে ঢুকলো। পরিচালক এই নতুন দলের জন্য তিন লিটার মদ এনে দিল। ওরা বসে ছিল দু দলে দু টেবিলে। প্রত্যেকেই মাথার টুপিগুলো খুলে টেবিলের ওপর

রেখেছিল। বাইরে রাখছিল ওদের ঘোড়াগ্‌লো।
জর্জ এবং নিক দ্‌জনেই খ্‌শী। তারা দ্‌জনেই দ্‌জনার প্রিয় পাত্র। ওরা জানতো বাড়ি যাওয়ার সময় ওদের ছাড়িয়ে বনে পে'াছে যাবে।
—তোমাকে তবে স্কুলে ফিরে যেতে হবে? নিক জানতে চাইল।
—আজ রাতেই। জর্জ উত্তর দিল। আমাকে দশটা চল্লিশের গাড়ি পেতে হবে মন্ট্রিয়াক্স থেকে।
—আশা করি আমাদের কালকের স্‌চী সম্পর্কে অবহিত আছ।
—আমাকে শিক্ষিত হতে হবে। জর্জ বলল, এই নিক তোমার ইচ্ছে করে না আমরা এক জায়গায় থাকি? চল দ্‌কী নিয়ে উঠে পড়ি দ্‌রে পাল্লার কোন এক ট্রেনে। ঘ্‌রে আসি পাহাড় উপত্যকা। সঙ্গে নেবো সোয়েটার আর পায়জামা আর মেরামতির দ্‌ একটা ছোট খাটো যন্ত্র। স্কুল কিংবা অন্য কোন অজ্‌হাত ছাড়ো।
—হ্যাঁ, চল সোয়াটজোয়ান্ড হয়ে, সেই স্‌ন্দর জায়গায়।
—যেখানে গতবার তুমি মাছ ধরতে গিয়েছিলে?
—হ্যাঁ।
তারা স্ট্র্‌ডেলটুকু খেয়ে নিল তারপর বাকি মদটুক।
জর্জ দেয়ালে হেলান দিয়ে চোখ দ্‌টো ব্‌জলো।
—মদ আমাকে সব সময় এইভাবে ভরে দেয়। সে বলল।
—খারাপ লাগছে তোমার? নিক জিজ্ঞেস করল।
—না, খারাপ লাগছে না, তবে অদ্ভুত মনে হচ্ছে।
—ব্‌ঝেছি।
—সত্যি! জর্জ বিস্মিত।
—আমরা কি আর এক বোতল নেব? নিক জানতে চাইল।
—আমি আর না।
তারা ঐখানেই বসে ছিল। নিক কন্‌ইটা টেবিলের ওপর রাখলো। জর্জ দেয়ালে পিঠ দিয়ে টান হল।
—হেলেনের কি বাচ্চা হবে? জর্জ দেয়াল থেকে পিঠ সরিয়ে এনে টেবিলের ওপর ঝ্‌কলো।
—হ্যাঁ।
—কখন?
—আগামী গ্রীষ্মে।
—তুমি খ্‌শি?
—হ্যাঁ।
—তুমি কি স্টেটসে ফিরে যাবে?
—সেই রকমই ভাবছি।

—তুমি যেতে চাও ?

—না।

—হেলেন ?

—না।

জর্জ চুপ করে বসে রইল। ওর দৃষ্টি খালি বোতল এবং খালি গ্লাসের দিকে।

—খুব খারাপ, বুঝলে ভীষণ খারাপ। সে বলল।

—না, ঠিক তা নয়। নিক বলল।

—কেন নয় ?

—তা জানি না। নিক উত্তর দিল।

—দুজনে মিলে স্কীইং এর জন্য স্টেটসে যাওয়ার কথা ভেবেছো কখনো ? জর্জ জানতে চাইল।

—আমি জানি না। নিকের ছোট্ট উত্তর।

— পর্বত বেশি নেই। জর্জ বলল।

—না, নিক বলল, শুধু পাথরে ভরা। শুধু কাঠ আছে তা আবার অনেক অনেক দূরে।

—হ্যাঁ, জর্জ একটু নড়েচড়ে বসল, ক্যালিফোর্ণিয়াও ঠিক এই রকম। সুইস যে এতক্ষণ বসে ছিল উঠে দাঁড়িয়ে হিসেব মিটিয়ে চলে গেল। জর্জ বলল, আমরাও যদি সুইস হতাম।

— ওদের সবার গলায় গলগন্ড আছে। নিক বলল।

—আমি বিশ্বাস করি না। জর্জ জানায়।

—আমিও তাই।

তারপর দুজনেই হো হো করে হাসতে থাকে।

—আমরা হয়তো আর কখনো স্কীইং-এ যেতে পারবো না নিক। জর্জ বলল।

—আমাদের যেতেই হবে। নিকের দৃঢ় গলা।

—ঠিক আছে আমরা যাবো।

—আমাদের যেতেই হবে।

—আমি মনে করি এ ব্যাপারে আমাদের শপথ নেওয়া দরকার। জর্জ বলল।

নিক উঠে দাঁড়ালো। জ্যাকেটটা ভাল করে জড়িয়ে নিয়ে স্কীর লাঠি দিয়ে মেঝেতে ঠুকলো।

—প্রতিজ্ঞা করা ভাল নয়, সে বলল।

তারা এরপর দরজা খুলে বেরিয়ে এল। বাইরে বেশ ঠান্ডা। তুষার পড়ছে। রাস্তাটা পাইন বনের মধ্য দিয়ে ওপরে উঠে গেছে।

নিক হাতে দস্তানা পরে নিল। জর্জ এরই মধ্যে হাটতে শুরু করে দিয়েছে। ও কাঁধে নিয়েছে ওর স্কী। এখন দৌড়ে বাড়ি যেতে পারলেই হয়।

এ ভেরি সর্ট স্টোরি

একদিন এক গরমের সন্ধ্যায় পাডুয়ায় তারা তাকে ছাদের ওপর নিয়ে এসেছিল, সে ওপর থেকে সমস্ত শহরটা দেখতে পাচ্ছে। চিমনিগুলো উঁচু হয়ে আকাশ ছুঁয়ে আছে। কিছুক্ষণের মধ্যে চারদিকটা কালো অন্ধকার হয়ে গেল। সার্চলাইটটা জ্বলে উঠলো। অন্যরা নিচে নেমে গেল ওদের সঙ্গে নিয়ে গেল বোতলগুলো। সে এবং লুজ ব্যালকনিতে বসে ওদের সব কথা শুনতে পাচ্ছিল। এরপর লুজ গিয়ে বসল বিছানার ওপর। এই গরম রাতেও সে শান্ত এবং তাজা।

গত তিন মাস ধরে লুজ রাত ডিউটির কাজ নিয়েছে। তারা সবাই ওর এই ডিউটি নেওয়ার জন্য খুশি। তাকে যখন অস্ত্রোপচার করার জন্য প্রস্তুত করা হচ্ছিল, সে সাজিয়ে দিচ্ছিল অপারেশন টেবিল। অস্ত্রোপচার করার আগে ওকে অ্যানেস্থেসিয়া করা হয়েছিল। সেই সময় ও নিজেকে ভীষণ ভাবে সংযত করে রাখতে চেষ্টা করছিল। এরপর যখন ও ক্রাচে ভর দিয়ে চলতে শুরু করল তখন দেহের মাপ মাপার জন্য লুজকে আর বিছানা ছেড়ে উঠে আসতে হত না। তখন সম্পূর্ণ ওয়ার্ডে রোগী ছিল খুব কম। এবং তারা প্রত্যেকেই কি করে শরীরের তাপ নিতে হয় জানতো। সবাই লুজকে ভালবাসতো। যেই সে ঘরের মধ্য দিয়ে হেটে ফিরতে থাকে তখন বার বারই শুধু ওর বিছানায় লুজের কথা মনে হয়।

সীমান্তে ফিরে যাওয়ার আগে তারা গিয়েছিলো ডুওমো এবং সেখানে জানিয়েছিলো প্রার্থনা। সেখানে শান্ত এবং আবছায়া আলোতে অন্যান্যরা জানাচ্ছিল প্রার্থনা। তারা বিয়ে করার জন্য প্রস্তুত, কিন্তু তাদের হাতে প্রচুর সময় ছিল না গীর্জার বিজ্ঞপ্তি বেরনো পর্যন্ত অপেক্ষা করা। আর দুজনের কারুরই জন্ম পরিচয় পত্র ছিল না। তারা নিজেরা ঠিক করে নিল যখন তারা বিবাহিত, প্রত্যেকে জানুক এটাই প্রেম এবং এই ব্যবস্থা করার জন্য তাদের কিছু হারাতে হবে না।

লুজ ওকে প্রচুর চিঠি পাঠিয়েছিল। কিন্তু যুদ্ধবিরতি না হওয়া পর্যন্ত সে একটি চিঠিও পায়নি। এর পর একসঙ্গে পনের খানা চিঠি এসে হাজির। সীমান্তে বসে চিঠি পেলে দারুণ আনন্দ হয়। সে পর পর চিঠির তারিখগুলো সাজিয়ে একটা একটা করে সব পড়ে ফেলল। ভিন্ন ভিন্ন চিঠির বক্তব্য ছিল ভিন্ন ভিন্ন রকম। কোনটা হাসপাতাল নিয়ে। কোন চিঠি ভরা তার ভালবাসার সংবাদ। দুঃখ ভরা কোন কোন লেখা অসম্ভব মর্মস্পর্শী। কিভাবে যে তাকে ছাড়া দিন কাটাচ্ছে, সে মাত্র ঈশ্বরই জানেন। এবং বিশেষ করে সম্পূর্ণ এই দীর্ঘ রাতে তাকে ছাড়া থাকার কথা —কল্পনা করতেও ভীষণ কষ্ট হয়। অদ্ভুত সব চিঠি।

যুদ্ধ বিরতির পর দুজনেই স্থির করেছিল বিয়ে করবে। তার আগে অবশ্যই তাকে বাড়ি ফিরে একটা চাকরীর জোগাড় করে নিতে হবে। লুজও ততদিন পর্যন্ত বাড়ি ফিরতে পারবে না যতদিন না পর্যন্ত ওর একটা ভাল চাকরী জুটছে এবং নিউইয়র্কে এসে লুজের সঙ্গে দেখা করে যাচ্ছে। এবং এটা নিশ্চিত যে তার কোন ড্রিংকের অভ্যেস হবে না। তার কোন বন্ধুদের দেখতে চাইবে না কিংবা স্টেটসের কারো সঙ্গে। শুধু ওর একটা কাজ পাওয়া জরুরী—তারপরই বিয়ে। পাড়ুয়া থেকে মিলান আসার পথে ট্রেনে দুজনের মধ্যে ঝগড়া বেঁধেছিল। কারণ শুধু একটাই—এই মুহূর্তে ওর বাড়ি ফিরতে না চাওয়া। মিলান স্টেশনে এসে দুজনেই দুজনার কাছ থেকে বিদায় নিল। চুম্বন দিয়ে বিদায় জানালো এই সময় আর কোন মনোমালিন্য নয়। লুজকে বিদায় এই কথাটা বলতে যেয়ে ওর গলা ধরে এসেছিল।

সে নৌকায় করে জেনোয়া থেকে আমেরিকা চলে গেল, লুজ ফিরে গেল পোরডেননে। এখানে একটা হাসপাতাল উদ্বোধন হবে। এ জায়গাটা ভীষণ নির্জন। মাঝে মাঝেই বৃষ্টি হচ্ছিল। এখানে ছিল এক ব্যাটেলিয়ান অরদিতি জুড়ে শহরের এক চতুর্থাংশ। শীতের এই বর্ষায় কাদা মাখা শহরে বাস করতে করতে ব্যাটেলিয়ানের মেজর লুজের মনের অনেক কাছে চলে এসেছিল। লুজ এর আগে কখনোই ইটালিয়ান ভাষা জানতো না। শেষ পর্যন্ত সে স্টেটসে পাঠিয়েছিল চিঠি, শুধুমাত্র একটা ছেলে এবং মেয়ের সম্পর্কের কথা লিখে। লুজ খুব দুঃখ পাচ্ছিল, ও বুঝতে পেরেছিল সম্ভবত সে তাকে ভুল বুঝবে এবং হয়তো এক সময় তাকে ক্ষমা করে দেবে। ও আশা করেছিল এই বসন্তেই হঠাৎ করে একদিন ওর বিয়ে হয়ে যাবে। লুজ ওকে প্রাণ মন দিয়ে ভালবাসতো, পরে বুঝতে পেরেছিল এটা শুধু মাত্রই একটি ছেলে এবং মেয়ের ভালবাসা। একদিন জীবনে ও বিরাট উন্নতি করবে। লুজ বুঝতে পেরেছিল—যা ঘটছে সবই মঙ্গলের জন্য।

মেজর বসন্তে ওকে বিয়ে করেনি কিংবা পরে কখনো। এ ব্যাপারে লুজ কোনদিন চিকাগো থেকেও কোন উত্তর পায়নি। এর কিছু দিন পর তাকে এক গোপন কঠিন রোগে ভুগতে হয়েছিল। এই রোগটি সে পেয়েছিল লুপ ডিপার্টমেন্ট স্টোরসের এক সেলস্ গার্লসের কাছ থেকে বারসঙ্গে সে গিয়েছিল ট্যাক্সি চড়ে লিংকণ পার্কের মধ্য দিয়ে।

দি কিলার্স

হেনরীর লাঞ্চ রুমের দরজা খোলা। দুজন এসে ঘরে ঢুকল। তারা গিয়ে বসল কাউন্টারে।
—তোমার কোনটি? জর্জ তাদের কাছে জানতে চাইল।
—আমি জানি না। একজন উত্তর দিল। তুমি কি খেতে চাও অল?
—আমি জানিনা। অল বলল, আমি জানিনা আমি কি খেতে চাই। বাইরে ক্রমশ অন্ধকার হয়ে আসছে। জানালা দিয়ে রাস্তার আলো দেখা যাচ্ছে। কাউন্টারের দুজন মেনু কর্ডটা দেখতে লাগলো। কাউন্টারের অন্য প্রান্তে বসে নিক আদম ওদের লক্ষ্য করছে। ঐ দুজন যখন ঘরে ঢুকল সে জর্জের সঙ্গে কথা বলছিল।
—আমি রোস্ট পর্ক খাবো অ্যাপল সস্ দিয়ে আর ম্যাসড্ পটেটোজ। প্রথম জন জানালো।
—ওটা এখনো তৈরী হয় নি।
—তাহলে মেনু কার্ডে রেখেছ কেন?
—ওটা ডিনারের জন্য। জর্জ পরিস্কার করে বুঝিয়ে বলল, আপনি ছ'টার সময় পেতে পারেন।
এই কথা বলার পর জর্জ কাউন্টারের পেছনে দেয়াল ঘড়ির দিকে তাকালো।
—এখন পাঁচটা বাজে।
—ঘড়ি বলছে পাঁচটা বেজে কুড়ি মিনিট হয়েছে। দ্বিতীয় জন বলল।
—ঘড়িটা কুড়ি মিনিট এগিয়ে আছে।
—ঘড়ি জাহান্নামে যাক। প্রথম জন বলল, এই মুহূর্তে খাওয়ার জন্য কি আছে।
—আমি আপনাকে যে কোন ধরনের স্যান্ডউইচ দিতে পারি। জর্জ জানালেন। আপনি হ্যাম কিংবা ডিপ, লিভার এবং বেকন অথবা স্টিক পেতে পারেন।

—আমাকে দিন সবুজ মটরের সঙ্গে চিকেন ক্রোকিউটিস্, ক্রিম সস্ আর মাস্‌ড পটেটোজ।
—এ গুলোও ডিনারের জন্য।
—আমরা যা চাইছি সেটাই আপনাদের ডিনারের জন্য তৈরী খাওয়া, এই আপনাদের কাজের বহর?
—আমি আপনাকে দিতে পারি হ্যাম এবং ডিম, বেকন এবং ডিম, লিভার—
—আমি হ্যাম এবং ডিম নেব, অল নামের মানুষটি জানালো। তার পরনে ডার্বি টুপি কালো ওভারকোট বুকে আড়াআড়ি ভাবে তাতে বোতাম আছে। তার মুখ সাদা এবং ছোট। সিল্ক মাফলার জড়ানো আছে তার গলায় হাতে আছে দস্তানা।
—আমাকে দিন বেকন এবং ডিম। অন্য জন জানালো। ওর মাপও অলের মত। দুজনের মুখ শুধু দু রকমের। অথচ দুজনে পোষাক পরেছিল যমজের মত। দুজনেই ওভার কোট পড়েছে ছোট। বসে আছে সামনের দিকে ঝুঁকে, তাদের কনুই দুটো কাউন্টারের ওপর রাখা।
—ড্রিংক করার মত কিছু আছে? অল জানতে চাইল।
—লিভার বিয়ার, বেভো, সিংগার-আল, জর্জ উত্তর দিল।
- তার মানে সব ধরণের ড্রিংক আছে?
—শুধু যেগুলো আমি বললাম।
—এটা একটা গরম শহর। অপর জন বলল, কি যেন বলে একে?
—সুমিট।
—তুমি শুনেছ কখনো? অল বন্ধুকে জিজ্ঞেস করল।
—না।
—রাতে এখানে কি করবে? অল জানতে চাইল।
—তারা ডিনার খেয়েছিল। বন্ধু উত্তর দিল। তারা সবাই এখানে এসে খুব বড় করে ভোজ খেয়েছিল।
—ঠিক বলেছেন, জর্জ বলল।
—আপনি মনে করছেন ঠিক আছে? অল বলল।
—নিশ্চয়ই।
- আপনি দারুন সুন্দর ছেলে, নয় কি?
—নিশ্চয়ই, জর্জ আবার জানালো।
- না, আপনি নন। অপর ছোট মানুষটি বলল, সে কি ভাল অল?
—সে বোবা। তারপর নিকের দিকে মাথা ঘুরিয়ে জিজ্ঞেস করল, আপনার নাম কি?
—অ্যাডমস্।
—আর একজন উজ্জ্বল ছেলে, অল বলল, ম্যাক্স, ও উজ্জ্বল ছেলে নয়?
ম্যাক্স বলল, এই শহর ভরা ভাল ভাল ছেলে।

কিছুক্ষণের মধ্যে জর্জ কাউন্টারে দুটো প্লেট এনে রাখলো। একটির মধ্যে হ্যাম এবং ডিম অন্যটিতে বেকন এবং ডিম আর এর পাশে পাশে রাখলো ফ্রায়েড পটেটোস। এরপর রান্নাঘরের ছোট ফোকর বন্ধ করে দিল।

—তোমার কোনটি ? অল জিজ্ঞেস করল।

—তোমার মনে নেই ?

—হ্যাম এবং ডিম।

—এই'ত ভাল ছেলে, ম্যাক্স বলল। সে একটু ঝুঁকে ওর প্লেটটা তুলে নিল। দুজনেই হাতে দস্তানা পরে খেতে শুরু করে দিল। জর্জ বসে বসে ওদের খাওয়া দেখতে থাকে।

—আপনি কি দেখছেন অমন করে ? ম্যাক্স জর্জের দিকে তাকালো।

—কিছু না।

—যা ব্বা বা, আপনি'ত আমার দিকে তাকিয়ে ছিলেন।

অল বলল, ম্যাক্স, হয়তো উনি মজা করছেন।

জর্জ হাসতে থাকে।

—তোমাকে হাসতে হবে না। ম্যাক্স তাকে বলল, তোমাকে একটুও হাসতে হবে না, বুঝলে ?

—ঠিক আছে। জর্জ গম্ভীর।

—অতএব সে সব বুঝতে পেরেছে। ম্যাক্স অলের দিকে তাকালো। সে বুঝতে পেরেছ এখন সব ঠিক আছে। এই'ত ভাল ছেলে।

—ওহ্ উনি একজন চিন্তাবিদ ! অল বলল। তাদের খাওয়া চলছে।

—কাউন্টারের নিচের ভাল ছেলের নাম কি ? অল ম্যাক্সকে জিজ্ঞেস করল।

—ওহে ভাল ছেলে, ম্যাক্স নিককে জানালো, তুমি তোমার ছেলে বন্ধুকে নিয়ে কাউন্টারের অপর দিকে আসবে ?

—কেন ? নিক জানতে চাইল।

—না, তেমন কোন ব্যাপার নয়।

—ভাল ছেলে তুমি একটু ঘুরে এস না। অল বলার পর, নিক উঠে কাউন্টারের পেছনে এসে দাঁড়ালো।

—এর অর্থ। জর্জ জানতে চাইল।

—এতে তোমার মাথা গলানোর কোন প্রয়োজন নেই। অল বলল, রান্নাঘর থেকে কে বেরিয়ে এল ?

—নিগার।

—নিগার আবার কে ?

—যে রান্না করে নিগার।

—তাকে ভেতরে চলে আসতে বল ?

—কারণ ?
—ওকে ভেতরে আসতে বল।
—আপনারা কোথায় বসে আছেন মনে করছেন ?
—আমরা কোথায় আছি কিছু জানতে চাই না। ম্যাক্স চীৎকার করে বলল। আমরা কি দেখতে বাজে ?
—তুমি বাজে কথা বলছ ? অল তাকে বলল। কি এই ছোকরার সঙ্গে তর্ক করছো। শোন ছেলে, সে জর্জকে বলল, নিগারকে এখানে বেরিয়ে আসতে বল ?
—আপনারা ওকে কি করবেন ?
—কিছু না। চতুর ছেলে, তোমার মাথা ব্যবহার কর। আমরা নিগারের কি করতে পারি ?
জর্জ ছোট্ট খিড়কিটা খুলতেই রান্নাঘরের ভেতরটা দেখা গেল। সে ডাকলো, স্যাম, এক মিনিটের জন্য এদিকে এসো।
রান্নাঘরের দরজা খুলে নিগার বেরিয়ে এল।
—আমায় কেন ডাকছেন ?
কাউন্টারে বসা মানুষ দুজন ওর দিকে তাকিয়ে দেখলো।
—ঠিক আছে নিগার তুমি ঐখানেই একটু দাঁড়াও, অল বললো।
স্যাম, সেই নিগার অ্যাপ্রন পরা অবস্থায় দাঁড়িয়ে দুজন লোকের দিকে তাকালো।
—ঠিক আছে স্যার।
অল টুল থেকে নিচে নামলো। তারপর বললো, চতুর ছেলে আমি নিগারের সঙ্গে রান্না ঘরে যাচ্ছি। নিগার তুমি তোমার রান্নার জায়গায় ফিরে যাও। চালাক ছেলে তুমিও যাও ওর সঙ্গে।
ছোট্ট মানুষটি নিক এবং স্যামের পেছন পেছন হাঁটতে লাগলো। রাঁধুনে তার জায়গায় ফিরে গেছে। ওদের যাওয়ার পর দরজা বন্ধ হয়ে গেল। মানুষটি জর্জের বিপরীত দিকে বসে থাকা ম্যাক্সকে ডাকলো। সে সরাসরি জর্জের দিকে না তাকিয়ে আয়নার দিকে তাকালো।
—ভাল, চতুর ছেলে, ম্যাক্স আয়নার দিকে তাকিয়ে বললো, তুমি কিছু বলছো না কেন ?
—কি সম্পর্কে !
— এই অল, ম্যাক্স ডাকলো, চতুর ছেলে জানতে চায় কি সম্পর্কে বলবে।
—তুমি বলে দিচ্ছ না কেন ? রান্নাঘর থেকে অলের গলার স্বর ভেসে এল।
—এ সম্পর্কে তুমি কি ভাবছো ?
—আমি জানিনা।
—তুমি কি মনে কর ?
ম্যাক্স আয়নার দিকে তাকিয়েই কথাগুলো বলছিল।

—আমি কিছু বলব না।

—এই অল, চতুর ছেলে বলছে সে কি চিন্তা করছে কিছুই বলবে না।

—আমি সব শুনতে পাচ্ছি। ঠিক আছে। অল রান্নাঘর থেকে বলে উঠলো। তারপর ছোট্ট খিড়কির মত জানালা খুলে জর্জকে বললো, শোন, চতুর ছেলে। একটু দূরে বারের কাছ ঘেঁসে দাঁড়াও। হ্যাঁ, বাঁদিকে ম্যাক্সের দিকে যাও। যেন ফটোগ্রাফার ছবি তোলার জন্য ব্যবস্থা নিচ্ছে।

—আমার সঙ্গে কথা বল, চতুর ছেলে। ম্যাক্স বলল, এখন যা ঘটতে চলেছে তার সম্পর্কে কি ভাবছো ?

জর্জ কোন উত্তর করল না।

—আমি তোমাকে বলবো। ম্যাক্স বলল, আমরা একজন সুইডিস্‌কে হত্যা করবো। ওলে অ্যান্ডার্সন যে একজন বড় সুইডিস্‌ তুমি নিশ্চয়ই জান ?

—হ্যাঁ।

—সে প্রতিদিন রাতে এখানে খেতে আসে। আসে না ?

—কখনো কখনো সে আসে।

—ঠিক ছ'টার সময় সে আসে, কি আসে না ?

—যদি সে আসে।

—আমরা ওসব কিছু জানি চতুর ছেলে, ম্যাক্স বলল, অন্য বিষয়ে কিছু বল। সিনেমা দেখতে যাও ?

—কখনো সখনো।

—তোমার সিনেমায় আরো বেশি যাওয়া উচিত। কেননা তোমার মত চতুর ছেলেদের বেশি করে সিনেমা দেখা প্রয়োজন।

—আপনারা কেন ওল অ্যান্ডার্সনকে হত্যা করতে চান ? সে আপনাদের কি করেছে ?

—সে আমাদের কোন কিছু করার সুযোগই পায় নি। এমন কি সে আমাদের কখনো দেখেও নি।

—এবং সে একবারই আমাদের দেখার সুযোগ পাচ্ছে। রান্নাঘর থেকে অল জানালো।

—আপনারা তাহলে ওকে হত্যা করবেন কেন ? জর্জ প্রশ্ন করলো।

—আমরা তাকে আমাদের বন্ধুর জন্য মারবো। বন্ধুকৃত্য করা, বুঝলে চতুর ছেলে।

—চুপ কর। রান্নাঘর থেকে অল বলল, অনেক বেশি কথা বলে ফেলছ।

—আমাকে চুপ করে থাকতে হবে, বুঝেছ চতুর ছেলে।

—আহ্‌ আবার কথা ! অল বলল, নিগার এবং আমার চতুর ছেলে দুজনে মজা উপভোগ করছে। আমি ওদের দুজনকে বেঁধে রাখতে চাই কনভেন্টে পড়া ছেলে মেয়েদের মত।

—তুমি নিশ্চয়ই কনভেন্টে ছিলে ?

—তুমি কিছুই জাননা।

—ঐ'ত তুমি সেই কসের কনভেন্টে ছিলে। যেখানে তুমি থাকতে।
জর্জ ঘড়ির দিকে তাকালো।
—যদি এখন ভেতরে কেউ আসে বলে দেবে রাঁধুনি নেই। তারপরও যদি কেউ ঢুকতে চায় তাহলে তুমি তাকে বলবে, আপনি নিজে গিয়ে রান্না করে নিন। বুঝতে পেরে'ছ ?
—ঠিক আছে, জর্জ বলল, এরপর আমাদের নিয়ে কি করতে চাও ?
—ও সবই নির্ভর করছে। ম্যাক্স বলল, এই মুহূর্তে তোমাকে ওসব বলা যাবে না।
জর্জ আবার ঘড়ির দিকে তাকালো। এখন ছ'টা বেজে পনের মিনিট। রাস্তার দিকের দরজা খোলা। একজন মোটর চালক এসে ভেতরে ঢুকলো।
—হ্যালো জর্জ, সে বলল, রাতের খাবার পাওয়া যাবে ?
—স্যাম বাইরে গেছে, জর্জ জানালো, ওর ফিরতে আধ ঘন্টার মত দেরী হবে।
—তাহলে রাস্তায় অন্য কোথাও চলে যাই। মোটর চালক চলে গেল।
জর্জ তাকালো ঘড়ির দিকে। এখন ছটা বেজে কুড়ি মিনিট।
—খুব ভাল, চতুর ছেলে। ম্যাক্স বলল, তুমি সত্যিকারের ভদ্রলোক।
—ও জানে তা না হলে এক ঘুষি মেরে ওর মাথা ঘুরিয়ে দেবো, অল রান্নাঘর থেকে কথাগুলো বলল।
—না, ম্যাক্স উত্তরে বলল, ঠিক তা নয়, চতুর ছেলে খুবই ভাল, আমি ওকে পছন্দ করি।
ঠিক ছ'টা পঞ্চান্ন মিনিটে জর্জ জানালো, সে আসছে না।
লাঞ্চ রুমে অন্য দুজন বসে ছিল। একবার জর্জ রান্নাঘরে এসে ওদের দুজনের জন্য হ্যাম এবং ডিমের স্যাণ্ডউইচ বানিয়ে নিয়ে এল। ওরা ওদের সঙ্গে স্যাণ্ডউইচ নিয়ে যাবে। রান্নাঘরে গিয়ে জর্জ দেখল নিক ও রাঁধুনি ঘরের কোণে দাঁড়িয়ে বাঁধা অবস্থায় দাঁড়িয়ে আছে। এমনকি ওদের মুখও তোয়ালে দিয়ে বাঁধা। অল একটা টুলে বসে আছে। ওর মাথায় ডার্বি টুপি। ওর সামনে ধরে রাখা আছে শটগান।
—চতুর ছেলে সবকিছু করতে জানে। ম্যাক্স বলল, সে রান্না করতে জানে, সবকিছু পারে। এবার একটা সুন্দরী মেয়ে দেখে বিয়ে করে ফেলো।
—হ্যাঁ। জর্জ বলল, কিন্তু আপনাদের বন্ধু অল অ্যাণ্ডার্সন আর বোধহয় আসছেন না।
—আর দশ মিনিট দেখা যাক। ম্যাক্স উত্তর দিল।
ম্যাক্স এরপর ঘড়ির দিকে তাকালো। সাতটা বাজে। দেখতে দেখতে সাতটা পাঁচ হয়ে গেল।
—অল, চলে এস। ম্যাক্স ডাকলো, আমরা চলে যাই। সে আর আসছে না।
—কেন আর একজন রাঁধুনি রাখছো না ? একজন খদ্দের জিজ্ঞেস করলো। তুমি লাঞ্চ কাউন্টার চালাবে কি ভাবে ? এই কথা বলে লোকটি চলে গেল।

— অল, চলে এসো, ম্যাক্স ডাকলো।

—অন্য দুজন ছেলে এবং নিগার কোথায় ?

—তারা ঠিক আছে।

—তুমি তাই মনে করো ?

—নিশ্চয়ই।

—আমি একদম পছন্দ করি না। অল জানালো, এটা চালু। তুমি ভীষণ কথা বল।

—তুমি শুধু যা তা বল। ম্যাক্স বলল, আমাদের ওদেরকে আনন্দ দিয়ে রাখতে হবে। তাই না ?

—তবু তুমি বেশ কথা বল। অল রান্নাঘর থেকে বেরিয়ে এল। ওভার কোটের নিচে শটগান রাখার জায়গায় ফোলা ফোলা দেখাচ্ছে। দস্তানা পরা হাতে সে জায়গাটা টান টান করতে চেষ্টা করছিল।

—তোমার ভাগ্য ভাল, চতুর ছেলে।

— এটা সত্যি কথা। ম্যাক্স অলের কথায় সায় জানালো। তুমি রেস খেলতে পারো, চতুর ছেলে।

এবার তারা দুজনে দরজার বাইরে চলে গেল। জর্জ ওদের লক্ষ্য করছিল জানালা দিয়ে। লাইট পোস্টের নিচ দিয়ে তারা রাস্তা অতিক্রম করল। আটোসাটো ওভার-কোটে এবং মাথায় ডার্বি টুপি পড়া ওদের দুজনকে অদ্ভুত লাগছিল। জর্জ ঠেলা পাল্লা সরিয়ে রান্নাঘরে এসে নিক এবং রাঁধুনির বাঁধন খুলে দিল।

—আমি আর এসব কিছু চাইনা বা। রাধুনি কাঁদো কাঁদো হয়ে জানালো। আমি এর মধ্যে থাকতে চাইনা।

নিক উঠে দাঁড়ালো। এর আগে কখনে ওর মুখে এভাবে তোয়ালে রাখতে হয়নি।

—বলুন। সে বলল, এ কি ধরণের ব্যাপার ? রাগে চীৎকার করে উঠলো ও।

—ওরা ওল অ্যান্ডাসনকে মারতে এসেছিল। জর্জ জানালো ওদের। সে খেতে ঢুকলে ওকে গুলি করবে—এই ওদের ইচ্ছে ছিল।

—অল অ্যান্ডার্সন ?

—সত্যি।

রাঁধুনি মুখে আঙ্গুল দিয়ে ইসারা করল।

—তারা চলে গেছে ? সে জানতে চাইল।

—হ্যাঁ, জর্জ বলল তারা এখনকার মত চলে গেছে।

—আমার মনে হয় না। রাঁধুনি সন্দেহ প্রকাশ করে।

জর্জ নিককে বলল, শোন বরং তুমি যেয়ে অল অ্যান্ডার্সনের সঙ্গে দেখা করে এস।

— ঠিক আছে।

—আপনি এ ব্যাপারে একদম নাক গলাবেন না। স্যাম, রাঁধুনি ওকে সাবধান করে দিল।

—তোমরা না চাইলে যেওনা। জর্জ জানালো।
—এর মধ্যে ঢুকলে আপনার কোন লাভ হবে না। ক্ষতি ছাড়া। রাঁধুনি আবার বলল।
কিন্তু নিক জর্জের কাছে বলল, আমি ওঁর সঙ্গে দেখা করতে যাবো। উনি কোথায় যেন থাকেন?
রাঁধুনি ঘুরে চলে যেতে লাগলো।
—ছোট ছেলেরা শুধু জানে ওরা কি করতে চায়। সে বলল।
—উনি থাকেন হীরথস্ রুমিং হাউসে। জর্জ নিককে জানালো।
—আমি সেখানে যাবো।
বাইরের আলোতে গাছের ঝোলা ডাল দেখা যাচ্ছে। রাস্তা দিয়ে নিক হাঁটতে শুরু করল। সামনের লাইট পোস্টের কাছে যেয়ে রাস্তা ঘুরে গেছে এবং পাশ দিয়ে নেমে গেছে অন্য ছোটা রাস্তা। এর পাশের তিনটি বড় বাড়িই হীরথস রুমিং হাউস। নিক দুটো ধাপ উঠে বেল টিপালো। একজন স্ত্রীলোক দরজায় এসে দাঁড়ালো।
—এখানে ওল অ্যান্ডার্সন থাকেন?
—আপনি দেখা করতে চান?
—হ্যাঁ, যদি উনি থাকেন।
নিক স্ত্রীলোকটির সঙ্গে কয়েকটি সিঁড়ি উঠে করিডোরের শেষে এসে দাঁড়ালো। স্ত্রীলোকটি দরজায় টোকা মারল।
—কে?
—মিঃ অ্যান্ডার্সন আপনার সঙ্গে একজন দেখা করতে চায়? স্ত্রীলোকটি জানালো।
—আমি নিক আদমস্।
—ভেতরে এস।
নিক দরজা দিয়ে ঘরে ঢুকলো। ওল অ্যান্ডার্সন তারসমস্ত জামা কাপড় পরে বিছানায় শুয়ে আছে। তিনি একজন হেভীওয়েট পুরস্কার পাওয়া মানুষ। তার বিছানার চাইতে তিনি লম্বা। দুটো বালিশের ওপর মাথা রেখে শুয়ে আছেন। সে নিকের দিকে তাকালো না।
—কি হয়েছে। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন।
—আমি ছিলাম হেনরীতে। নিক বলল, দুজন ভেতরে ঢুকে এসে আমাকে আর রাঁধুনিকে বেঁধে ফেলল। বলল, আপনাকে তারা মেরে ফেলতে চায়।
এই কথাগুলো বলতে খুব খারাপ লাগছিল। শুনে ওল অ্যান্ডার্সন কোন উত্তর করলেন না।
—তারা আমাদের রান্নাঘরে আটকে রাখলো। নিক বলে চলে। আপনি খেতে গেলে তারা আপনাকে মেরে ফেলবে—সেইভাবে প্রস্তুত হয়ে ছিল।
ওল অ্যান্ডার্সন দেয়ালের দিকে তাকিয়ে রইলেন কোন উত্তর করলেন না।

—জর্জ চিন্তা করে বলল, আমি যেন আপনার কাছে এসে এই কথা জানাই। ওল অ্যান্ডার্সন বললেন, এ ব্যাপারে আমি কি করতে পারি ?
—তারা দেখতে কেমন ছিল আপনাকে বলবো ?
—তারা কেমন দেখতে সে ব্যাপারে আমি কিছু জানতে চাইনা। ওল অ্যান্ডার্সনের মুখ দেওয়ালের দিকে। আমাকে এই খবর জানানোর জন্য তোমায় ধন্যবাদ।
—ঠিক আছে।
বিছানায় শোয়া বিরাট মানুষটার দিকে নিক তাকালো।
—আমি কি পুলিশের কাছে যাবো ?
—না। অল অ্যান্ডার্সন বললেন। এটা ভাল হবে না।
—আমি কি এ ব্যাপারে কিছু করতে পারি ?
—না, তোমার কিছু করার নেই।
—হতে পারে, এটা একটা মিথ্যা কিছু।
—না, এটার পুরোটাই মিথ্যে নয়।
ওল অ্যান্ডার্সন দেওয়ালের দিকে গড়িয়ে গেলেন।
—শুধুমাত্র কথা হল, সে দেয়ালের দিকে মুখ করে বলতে লাগলেন, আমি নিজে কিছুতেই ঠিক করতে পারিনি ঘর থেকে বেরুবো কিনা। সমস্ত দিন ধরে আমি এখানেই আছি।
—আপনি শহরের বাইরে যাননি ?
—না, ওল অ্যান্ডার্সন বললেন, চারদিকে যা ঘটছে সে ব্যাপারে ওয়াকিবহাল হচ্ছিলাম।
উনি আবার দেয়ালের দিকে মুখ করলেন।
—এখন কি আর কিছু করার নেই ?
—অন্য কোন উপায়ে এর ব্যবস্থা নেওয়া যায় না।
—না, আমি ভুল করে পেয়েছি। তিনি একইভাবে মোটা গলায় কথাগুলো বললেন। এখন আর কিছু করার নেই। আমি কিছুক্ষণ বাইরে বেরিয়ে যাবো।
—আমি বরং জর্জের সঙ্গে যেয়ে কথা বলি। নিক বলল।
—এতদূর পর্যন্ত আসার জন্য তোমায় ধন্যবাদ।
নিক বেরিয়ে চলে এল। দরজা বন্ধ করতে না করতেই দেখতে পেল, ওল অ্যান্ডার্সন সেই ভাবেই সমস্ত জামা কাপড়গুলো পরে নিল। আর শুয়ে শুয়ে তাকিয়ে রইল দেয়ালের দিকে।
—তিনি সারাদিন এই ঘরের মধ্যেই আছেন। নিচের সিঁড়িতে দাঁড়িয়ে বাড়ির মালকিন জানালেন, আমার মনে হচ্ছে উনি সুস্থ নন। আমি তাকে বলেছিলাম মিঃ অ্যান্ডর্সন আপনার উচিত বাইরে যেয়ে একটু হাঁটা চলা করা। কিন্তু সেটুকুও ভাল লাগে নি।

—তিনি একদম বাইরে বেরুতে চান না।
—আমার মনে হয় উনি সুস্থ বোধ করছেন না। ভদ্রমহিলা বললেন, তিনি সত্যিকারের একজন সুন্দর ব্যক্তি।
—আমি জানি।
—আপনি ওর মুখ না দেখলে ওর সম্পর্কে কিছুই বুঝতে পারবেন না। ভদ্রমহিলা বললেন; তারা রাস্তার মুখে দরজার কাছে দাঁড়িয়ে কথা বলছেন। তিনি সত্যি একজন সজ্জন ব্যক্তি।
—শুভ রাত্রি, শ্রীমতী হীরস্। নিক বলল।
—আমি শ্রীমতী হীরস নই। ভদ্রমহিলা জানালেন, তিনি এই বাড়ির মালিক। আমি ওর পরিবর্তে দেখা শোনা করি। আমি শ্রীমতি বেল।
শুভরাত্রি, শ্রীমতী বেল।
—শুভরাত্রি, ভদ্রমহিলা বললেন।
নিক প্রথমে অন্ধকার পথ দিয়ে হেঁটে ল্যাম্প পোস্টের তলা দিয়ে তারপর এসে হেনরির খাওয়ার ঘরে উপস্থিত। জর্জ ভেতরে ছিল, কাউণ্টারের পেছন দিকে।
—তুমি দেখা করতে পেরেছো ওদের সঙ্গে?
—হ্যাঁ, নিক জানালো। উনি তার ঘরের মধ্যে, বাইরে যেতে পারে না। রাঁধুনি নিকের গলা শুনে দরজা খুলে দাঁড়ালো। তারপর বলল, আমি এসব শুনতে চাই না।
—এসব ঘটনার কথা বলছে? জর্জ জিজ্ঞাসা করল।
—তিনি এজন্য কি করবেন?
—কিছু না।
—তারা তাকে মেরে ফেলবে?
—আমার মনে হয় তাই।
—তিনি নিশ্চয়ই চিকাগোর ব্যাপারে গুলিয়ে ফেলেছেন।
—আমারও তাই মনে হয়। নিক বলে।
—এটা এক অদ্ভুত ব্যাপার।
জর্জ কোণা থেকে একটা তোয়ালে জোগাড় করে কাউণ্টার মুছতে লাগলো·
—আমি অবাক হয়ে যাই। তিনি কি করেছেন। নিক বলল।
—কেউ নিশ্চয় বিশ্বাসঘাতকতা করেছে। তাই তারা মারতে চায়।
—আমি ওকে শহরের বাইরে নিয়ে যাব। নিক বলল।
—হ্যাঁ, এটাই ঠিক। জর্জ কিছুটা নিশ্চিন্ত।
—আমি কিছুতেই ভেবে উঠতে পারছি না যে তিনি অপেক্ষা করে থাকবেন, এবং কিছুক্ষণের মধ্যে তিনি হারিয়ে যাবেন। সত্যি এসব আর ভাবা যায় না।
—ভাল, জর্জ বলল, তোমাকে ওসব ভাবতে হবে না।

দি স্নোজ অফ কিলিমনজারো

কিলিমনজারো বরফে ঢাকা পর্বত। ১৯,৭১০ ফুট উঁচু। আফ্রিকার উচ্চতম পর্বত। এর পশ্চিমের শৃঙ্গের নাম নগাজি নগাই—ঈশ্বরের ঘর। এই শৃঙ্গের কাছাকাছি এক ধরনের চিতাবাঘ বাস করে। এত উঁচুতে চিতাবাঘ কিভাবে বাস করছে এবং কি খুঁজছে, আজ পর্যন্ত তা কেউ আবিষ্কার করতে পারেনি।

সবচেয়ে আশ্চর্যের বিষয় কি জান এর কোন ব্যাথা নেই, সে বলল। এই ভাবে তুমি এর শুরু হওয়া অনুভব করতে পারো।

—সত্যি ?

—পুরোপুরি। গন্ধের জন্য আমি খুবই দুঃখিত। যদিও তুমি বিরত বোধ করবে।

— না, ওভাবে বোলো না।

—ওদের দিকে তাকাও। সে বলল, দেখতে পাচ্ছো নাকি এখনো সেই গন্ধ বয়ে আসছে ?

মিমোশা গাছের বিস্তৃত ছায়ায় মানুষটি একটি চৌকির ওপর শুয়ে। কিছুক্ষণের মধ্যে ছায়া সরে যেয়ে পড়ে সমতল ভূমির উজ্জ্বল জায়গায়। সেখানে তিনটি বড় পাখি উবু হয়ে বসে আছে। সেই মুহূর্তে আকাশে উড়ল আরো এক ডজন। যত দ্রুত ওরা উড়ছিল ওদের ছায়াগুলোও সরে সরে যাচ্ছিল তত দ্রুত।

—যেদিন থেকে ট্রাকটা ভেঙেছে সেদিন থেকে ওরা আছে ওখানে। সে বলল।

আজকেই প্রথম কেউ মাটিতে নেমেছিল। আমি খুব ভাল করে ওদের যাওয়া লক্ষ্য করছিলাম, যদি কোনসময় ওদের আমার গল্পে ব্যবহার করতে হয়। এখন সে সব মজা লাগছে।

—আশাকরি তুমি আর করবে না। মেয়েটি বলল।

—আমি শুধু বলছিলাম, সে বলল। আমার কথা বলা অনেক সহজ। কিন্তু আমি তোমাকে একটুও বিরক্ত করতে চাইনা।

—তুমি জান এতে আমি বিরক্ত হই না। জানায় মেয়েটি, আমি এমন ঘাবড়ে গিয়েছিলাম যে কিছুই করতে পারছিলাম না। আমাদের এ ব্যাপারটা খুব সহজ করে নিতে হবে যতক্ষণ না আমরা সমতলে পেঁাছচ্ছি।

—বা সমতল যতক্ষণ না আসছে।

—দয়া করে আমায় বল আমি কি করি। আমার নিশ্চয়ই কিছু করা উচিত।

—তুমি তোমার পা সরিয়ে নিতে পারো। তাহলে ওটা থামতে পারে, যদিও আমার সন্দেহ আছে। অথবা তুমি আমাকে মারতে পারো। তুমিও ভাল গুলি চালাতে পারো। আমি তোমায় গুলি চালাতে শিখিয়েছি, শেখাই নি বল?

—দয়া করে ওভাবে কথা বলো না। আমি কি তোমাকে পড়তে জানি না?

—কি পড়তে?

—কোন বই যা কিনা আছে বইয়ের থলির মধ্যে।

—আমি এসব কিছুই শুনতে পাচ্ছি না, সে বলল। এর চেযে কথা বলা সহজ। আমবা ঝগড়া করবো তাহলে আমাদের সময় কেটে যাবে।

—আমি ঝগড়া করি না। আমি কখনো ঝগড়া করতেও চাই না। আমরা যেন আর ঝগড়া না করি। যতই আমরা ঘাবড়ে যাই না কেন। হয়তো আজকে ওরা অন্য পথ দিয়ে ফিবে আসবে। হয়তো সমতলও আসবে।

—আমি কোথাও যেতে চাই না, মানুষটি বলল। তোমার কাছে যতক্ষণ না সহজতম হচ্ছে ততক্ষণ এখান থেকে কোথাও যাওয়ার কোন অর্থই হয় না।

—ওটা কাপুরুষতা।

—একজন মানুষকে তার নাম ধরে না ডেকে তাকে ইচ্ছেমত সহজে মরতে দিতে পারো? আমাকে শুধু শুধু দোষারোপ করে কি লাভ?

—তুমি নিশ্চয়ই মরতে যাচ্ছ না।

—বোকার মত কথা বলো না। আমি এখন মরে যাচ্ছি। ঐ বেজন্মাদের জিজ্ঞেস কর। সে বসে থাকা বিরাট পাখিগুলোর দিকে তাকালো, তাদের ন্যাড়া মাথাগুলো পালকের খাঁজে ডুবে আছে।

—এরা প্রায় প্রত্যেক ক্যাম্পের চারদিকে আছে। তুমি কখনো দেখতে পাবে না। আর তোমার মৃত্যু অসম্ভব যদি ওদের পরিত্যাগ না কর।

—তুমি কোথায় এসব কথা পড়েছ? সত্যিকারের তুমি একটা বোকা।

—অন্য কারো কথা ভাবতে পারো তুমি।

—খ্রীস্টের দোহাই, সে বলল।

কিছুক্ষণের জন্য সে শুয়ে পড়ল। ওর দৃষ্টি জঙ্গলের কোণার দিকে। সেখানে একটা জেব্রার দল। তাদের সাদা রঙ সবুজ বনানীর ওপর। একটি বড় গাছের নিচে শান্ত সুন্দর ক্যাম্প এটি। সামনেই পর্বত। স্বচ্ছ সুন্দর ভাল জল কাছেই।

—তুমি আমাকে বুঝতে চাও না? মেয়েটি জানতে চাইল। সে একটা ক্যানভাসের চেয়ারে বসে আছে ছেলেটির চৌকির পাশে। বাতাস বয়ে আসছে ওপর দিকে।

—না, ধন্যবাদ।

—ট্রাকটা হয়তো আসবে।

—আমার ও নিয়ে কোন ভাবনা নেই।

—আমি করি।

—তুমি 'ত অনেক কিছু নিয়েই ভাবতে চাও। আমি তা করি না।

- অনেক বিষয়ে নয়, হ্যারি।

—ড্রিংকের কি হল?

—তোমার পক্ষে এটা খুবই খারাপ। ব্ল্যাকে লিখেছে যে কোন ধরনের মাদকদ্রব্য বর্জন করা উচিত। তুমি ড্রিংক করো না।

—মলো! চীৎকার করে ডাকলো ছেলেটি।

—বলুন, বাওনা।

—সোডা আর হুইস্কি নিয়ে আয়।

—আচ্ছা

—তোমার উচিত নয় কিন্তু, মেয়েটি বলল। পরিত্যাগ করা বলতে আমি তাই বুঝি। তোমার পক্ষে এটা খুবই ক্ষতিকারক। আমি জানি এটা তোমার পক্ষে ভাল নয়।

—না, ছেলেটির দৃপ্ত গলা। আমার পক্ষে ভাল।

সুতরাং এখন সবকিছুরই শেষ, সে চিন্তা করল। তাই ওর কোন ভাবেই এই পরিবর্তন—শেষ করে নয়। এবং এই ভাবেই খুঁটিনাটি বিষয় নিয়ে মতান্তরের শেষ হয় পাণীয়তে এসে। যদিও তার ডান পায়ে শুরু হয়েছে গ্যাংগ্রীন—অসাড় লাগে। আর মাঝে মাঝেই নিজেকে মনে হয় ভীষণ ক্লান্ত হয়তো এখানে সব শেষ। তবু, এখন যা আসছে। এ বিষয়ে তার সামান্যই ঔৎসুক্য। দীর্ঘ কয়েক বছর তাকে চেপে রেখেছিল। তাই এখন কোন কিছুতেই আর তেমন করে মনকে দুলিয়ে দেয় না। আশ্চর্য, কত সহজেই এ ব্যাপার ক্লান্ত করে তুলেছে।

এখন সে আর কখনো লিখবে না, যে বিষয়ে সে লিখবে ভেবেছিল যতক্ষণ না সে বিশেষ ভাবে জানতে পারছে। লিখতে কখনো কখনো সে ভুলও করতে পারে। কিংবা শুরু করতে যেয়ে অকারণ কিছু গাফিলতি।

—আমি আর কখনো আসবো না, মেয়েটি বলল। তারপর তাকিয়ে রইল ওর দিকে। হাতে ছিল একটি কাচ। তা দিয়ে ঠোঁটের ওপর বাড়ি দিচ্ছিল। তুমি এ জাতীয় জিনিস কখনোই প্যারিসে পাবে না। তুমি সব সময় বলেছ প্যারিস তোমার খুব প্রিয়। আমরা কয়েকদিন প্যারিসে থাকতে পারি কিংবা যেতে পারি কোথাও। আমি বলেছি তুমি চাইলে যে কোন জায়গায় যেতে পারি। এমন কি শুটিং করার জন্য হাঙ্গেরীতে গেলেও আমি খুশি থাকবো।

—টাকাটা তোমার, তাইতো? ছেলেটি বলে।

—ওসব কথা বোলনা, মেয়েটি জানায়, যা কিছু আমার রয়েছে তা তোমারও। এ সব কিছুর ভার আমি তোমার ওপরই ছেড়ে দিয়েছি। তুমি যেখানে যেতে বলেছো, যা করতে বলেছো—সবই করেছি। কিন্তু আমার ইচ্ছে এখানে আর আসবো না।

—তুমি বলেছিলে তোমার এ জায়গা পছন্দ।

—হ্যাঁ, বলেছিলাম যখন তুমি ভাল ছিলে। কিন্তু এখন এ জায়গাকে আমি ঘৃণা করি। আমি বুঝতে পারি না তোমার পায়ে এরকম অবস্থা হওয়ার কারণ কি। এরকম ঘটনা ঘটার জন্য আমরা এমন কি করলাম?

—আমার যতদূর মনে পড়ে প্রথম বার আমি চুলকে আইডিন দিতে ভুলে যাই। তারপর সেদিকে আমার কোন খেয়ালই ছিল না। আস্তে আস্তে ঘা চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ে। শেষে একসময় গ্যাংগরিন-এর রূপ নিয়ে নিল। কথাগুলো মেয়েটির মুখের দিকে তাকিয়ে ছেলেটি বলল, তাছাড়া আর কি বল?

—আমি সে ব্যাপারে কিছু বলছি না।

—এর চেয়ে যদি আমরা একটা ভাল মেকানিক ভাড়া করতাম এই অর্ধশিক্ষিত কিকুই ড্রাইভার না নিয়ে তাহলে আমাদের এরকম দুর্দশায় পড়তে হত না।
সে সময় মত তেলের মাপ দেখে নিত আর ট্রাকের বিয়ারিংও পুড়ত না।

—আমি কিন্তু তাও বলতে চাই নি।

—যদি তোমার নিজের লোকজন না ছেড়ে দিতে, পুরনো ওয়েস্ট বারি, সারাটোগো, পামভু বেলাভুমির মানুষজনরা তুলে নিত আমায়...

—কেন? আমি তোমাকে ভালবাসি। ওটা মোটেও ভাল হত না। আমি এখনো তোমায় ভালবাসি। আমি সবসময় তোমাকে ভালবাসবো। তুমি আমাকে ভালবাস না?

—না, ছেলেটির গম্ভীর উত্তর। আমি মনে করি না। আমার কখনো মনে হয় না।

—হ্যারী, তুমি কি বলছো? তোমার মাথা নিশ্চয়ই তোমার মধ্যে নেই।

—না, আমার বেরিয়ে যাওয়ার মত তেমন কোন মাথা নেই।

—আর খেয়ো না লক্ষ্মীটি, মেয়েটি বলল, লক্ষ্মীটি আর ড্রিংক করো না। আমরা যতটা পারবো নিজেদের কাজ করে ফেলবো।

—তুমি করে ফেল, সে বলল, আমি ভীষণ ক্লান্ত।

এখন তার চোখের সামনে ভেসে উঠছে পুরনো সব কথা। পুরনো স্মৃতি। ছেলেটির মনে হয় ও যেন সেই কারাগ্যাচ রেলওয়ে স্টেশনের সামনে দাঁড়িয়ে আছে। তার সঙ্গে আছে হেড লাইটের সাজসরঞ্জাম। সে সৈন্য থেকে অবসর নেওয়ার পর থ্রেস পরিত্যাগ করেছিল। এসব বিষয়ও তার লেখা থেকে বাদ পড়ে আছে। সেই সকালে জলখাবারের সময় জানালা দিয়ে তাকালে বুলগেরিয়ার পর্বতে জমে থাকা তুষার দেখা গেলে ন্যানসেন্সে সেক্রেটারী বৃদ্ধকে জিজ্ঞেস করত, যদি এগুলো সব তুষার হত? এর উত্তরে বৃদ্ধ জানাতো এগুলো তুষার নয়। তুষার পড়তে এখনো দেরি আছে। এরপর বৃদ্ধের কথার পুনরাবৃত্তি করে সেক্রেটারী। ও মেয়েদের জন্যেও আমরা ভুল করেছি। ঐগুলো তুষার নয়। কিন্তু পরে আবার বুঝতে পারে ঐ গুলোই তুষার তাই তাদের সেখানে পাঠিয়েছিল। এবং এগুলো ছিল সত্যি সত্যি তুষার তার ওপর দিয়ে তারা হেঁটেছিল সেই শীতে যতক্ষণ না পর্যন্ত তাদের মৃত্যু হয়।

সেইবছর বড়দিনের পুরো সপ্তাহ জুড়ে তুষারপাত হয়েছিল গোয়েরতালে। তারা সেখানে যেয়ে সেই বছর এক কাঠুরের বাড়িতে ছিল। তাদের সঙ্গে ছিল বিরাট এক পোরসিলিনের স্টোভ যা রাখতে ঘরের প্রায় অর্ধেক জায়গা লেগেছিল। তাদের শোয়ার জন্য ব্যবস্থা করা হয়েছিল বীচ পাতার ম্যাট-রেস। এমন একটা সময় এল যখন তার পায়ের পাতা পর্যন্ত তুষার। সেই সময় পেছনে পুলিশ এসে হাজির হয়েছিল। তাকে দিয়েছিল উলের মোজা এবং অপেক্ষা করেছিল সেখানে যতক্ষণ না পর্যন্ত পায়ে চলা পথগুলো পরিষ্কার হয়ে যায়।

বড়দিনের সময় স্রুঞ্জে তুষার এমন উজ্জ্বল দেখায়, চোখে ধাঁধা লেগে যায়। তুমি তখন যদি বাইরে তাকাও দেখতে পাবে প্রত্যেকে চার্চ থেকে বাড়ি ফিরে আসছে। নদীর ধার দিয়ে পথ চলে এসেছে তার পাশে খাড়াই পাইনের পাহাড়। তাদের কাঁধে স্কী'র ভারি সরঞ্জাম। মসৃণ শুভ্র তুষারের ওপর নিঃশব্দ প্রকৃতি। কোন উঁচু জায়গা থেকে পড়লে মনে হবে পাখির মত।

এই এক সপ্তাহ তাদের ম্যাডেলনা-র হসে থাকতে হয় তুষার পরিবৃত হয়ে। কিছু করার থাকেনা। তাই সমস্তদিন শুধু তাস খেলা লণ্ঠন জ্বালিয়ে। খেলায় সবসময় স্টেকস্ই জিততে থাকে। বেশির ভাগ হেরে যায় হেরর লেন্ট। এবং শেষ পর্যন্ত সে কপর্দকশূন্য হয়ে যায়। সে তাকে এখন দেখতে পাচ্ছে, ওর লম্বা নাক। তাস তুলে সে খেলা শুরু করছে—স্যানস ভয়র। এরপর থেকে ওখানে চলতে থাকে জুয়া। আবার যখন একদম তুষার থাকে না তখন ও জুয়া খেলা হয়। এই ভাবে জীবনের সব

সময়টুকু তাকে কাটাতে হচ্ছে জুয়ার মধ্য দিয়ে।

কিন্তু এ সমস্ত কোন বিষয় নিয়ে একটি লাইন ও কখনো সে লেখেনি। না ঠান্ডা নিয়ে কিংবা বড়দিনের সেই উজ্জ্বল দিনগুলো নিয়ে। পর্বতের মধ্য দিয়ে আড়াআড়ি ভাবে যেখানে থেকে সমতল ভূমি দেখা যেত সেখানে জনসন একরকম উড়ে এসেছিল অস্ট্রিয়ান অফিসারকে বধ মারার জন্য। এবং যেই তারা দৌড়ে এপাশ ওপাশ ছুটে গিয়েছিল তাদের ওপর গোলা এসে পড়ে। পরে জনসনের কথা মনে পড়েছিল ও যখন এসেছিল মেসে। কিংবা ওর অন্যান্য সব কথা। এই সমস্ত শোনার পর কেউ কেউ ওকে আখ্যা দিয়েছিল, এই হত্যাকারী বেজম্মা।

তারাও অস্ট্রিয়ানই ছিল। তারা হত্যা করেছিল, তাদের সঙ্গে স্কী খেলছিল সে। না, ঠিক তা নয়। হানস, যার সঙ্গে এ কবছর স্কী খেলেছে, সে আছে কেইসার-জাগরসে এবং তারা শিকার করতে যেত, নিজেদের মধ্যে আলোচনা হত পসাবিওর যুদ্ধ নিয়ে অথবা পেরটিকা-আক্রান্ত নিয়ে। এ সমস্ত কোন বিষয় নিয়ে সে একটি শব্দও লেখে নি। ভোরালবার্গ কিংবা আরালবার্গে সে কটা শীত কাটিয়েছিল? সম্ভবত চার বছর হবে তারপর মনে পড়েছিল সেই লোকটির কথা যে একটি খ্যাকশিয়াল বিক্রী করতে এসেছিল। তখন তারা ব্লুডেনসে হাঁটছিল। প্রত্যেকে গড়ান গড়িয়ে আনন্দ উপভোগ করছিল। গান করছিল হি···হো গড়ানের শেষটুকু খাড়াই এবং সোজা, শেষ তিনটে পাক খেয়ে গর্ত অতিক্রম করলে বরফের পথ। হোটেলের পেছনে। জানলা দিয়ে হোটেলের আলো দৃশ্যমান। ভেতরটা ধোঁয়া ধোঁয়া। নতুন মদের বোতলের গন্ধ ঘরময়। একোর্ডিয়ান বাজাচ্ছে তারা।

—প্যারিসে আমরা কোথায় থাকবো? সে মেয়েটিকে জিজ্ঞেস করল, যে তার পাশে ক্যানভাসের চেয়ারে বসে আছে, এখন, আফ্রিকায়।

—ক্রিলনে থাকবো। তুমি জানো।

—আমি কি করে জানবো?

—যেখনে আমরা সব সময় থাকতাম।

—না, সব সময় নয়।

—সেখানে প্যাভিলিয়ন-হেনরীর কোয়াটার সেইন্ট জারমেইনে। তুমি'ও ঐ জাগাটি ভালবাস।

—ভালবাসা অনেকটা গোবরের মত, হ্যারী বলল, এবং আমি সেই মোরগ যে শুধু তার ওপর ডেকে চলেছে ক্রমান্বয়ে।

—যদি তোমাকে চলে যেতে হয়। মেয়েটি বলল, তা হলে কি প্রয়োজন আছে সবকিছু হত্যা করে তার পেছনে থাকা? তুমি কি হত্যা করতে চাও তোমার ঘোড়া, তোমার

স্ত্রী এবং পর্ড়িয়ে দিতে চাও তোমার জিন এবং বর্ম ?
—হ্যাঁ, সে বলল, তোমার ঐ অর্থই ছিল আমার বর্ম।
—কখনো না।
—ঠিক আছে। আমি বন্ধ করছি। তোমাকে কোনরকম আঘাত করতে চাই না।
—একটু দেরি হয়ে গেছে।
—তাহলে ঠিক আছে, যে ভাবে তোমায় বলে চলেছিলাম সে ভাবেই বলে চলি। ওটা অনেক আনন্দদায়ক। যে ব্যাপারটা সত্যিকারের তোমার সঙ্গে করতে চাই তা এখনো করে উঠতে পারলাম না।
—না, এটা সত্যি কথা নয়। তুমি অনেক কিছুই করতে চেয়েছ এবং সবকিছু যা করাতে চেয়েছ তা আমি করেছি।
—ওহ ! খ্রীস্টের দোহাই তোমার এই ঘ্যান-ঘ্যানানি বন্ধ করবে ?
ছেলেটি মেয়েটির দিকে তাকালো। ও কাঁদছে।
—শোন, সে বলল, তুমি কি মনে কর এসব করা মজা ? আমি নিজেই বুঝি না কেন এ সব করছি। তোমাকে হত্যা করে বাঁচিয়ে রাখতে চাই—আমার স্বপ্ন। আমারা যখন কথা বলতে শুরু করেছিলাম তখন আমি ঠিক ছিলাম। আমি কিন্তু এই প্রসঙ্গে আমার কথা বলছি না। অথচ আমি এখন তোমার প্রতি নির্দয় এবং যতটুকু আমার পক্ষে হওয়া সম্ভব। ডার্লিং আমি এতক্ষণ যা বলেছি তা নিয়ে একটুও মন খারাপ করো না। আমি তোমাকে ভালবাসি, সত্যি। তুমি জানো আমি তোমাকে ভালবাসি। আমি তোমাকে যে ভাবে ভালবেসেছি এভাবে আর কাউকে কখনো ভালবাসিনি।
এরপর কিছুক্ষণের জন্য ছেলেটি চুপ করে শুয়ে থাকতে চেষ্টা করল।
—তুমি আমার মিষ্টি, প্রাণ।
—এই শয়তানি, ছেলেটি যেন হঠাৎ আবার উন্মত্ত। এই বড়লোকের বাচ্চা। আবার সেই কবিতা। আমি এখন সম্পূর্ণ কবিতায় ভরা। পচা এবং কবিতা। বাজে কবিতা।
—থামো, থামো হ্যারী, দোহাই তোমার। হঠাৎ এখন এমন রূপ ধারণ করলে কেন ?
—আমি কোন কিছু ছেড়ে দিতে চাই না। পুরুষটি বলল, আমি কোন কিছু পেছনে ফেলে দিতে চাই না।
এখন সন্ধ্যা। সে ঘুমে থেকে উঠেছে। সূর্য চলে গেছে পর্বতের পেছনে, তার ছায়া পড়েছে সমস্ত জায়গা জুড়ে, সমতল ভূমিতে। ক্যাম্পের কাছাকাছি কয়েকটি ছোট জন্তু তখনো খেয়ে চলেছে। পুরুষটি দেখছিল, ওরা ভাল ভাবে জঙ্গল থেকে বেরিয়ে এসে ঘুরে বেড়াচ্ছে। মাঠে এখন আর কোন পাখি নেই। ফিরে গেছে গাছে। তার একদম কাছের ছেলেটি বসেছিলে তার পাশে। বিছানার ওপর।
—মেমসাহেব শিকারে গেছে। ছেলেটি বলল, বাওনা আপনি কিছু চাইছেন ?

কিছুই না।
সে খানিকটা মাংস জোগাড়ের জন্য শিকারে গেছে। একদম ওর মতই শিকারের বিভিন্ন পদ্ধতি মেমসাহেবের জানা আছে। ও সব কিছু খেয়াল করে। চিন্তাশীলা ও কোন জিনিস জানতে পারলে তার ওপর পড়াশোনা করতে চেষ্টা করে।
এটা শুধুই মেয়েটির একার দোষ নয়। যখন সে মেয়েটির কাছে আসে তখন তার সবকিছু শেষ হয়ে যায়।
একজন মেয়ে কি করে বুঝতে পারবে তুমি যা বলছ তা কোন কিছু মনে করার জন্য নয়। এই বলা সম্পূর্ণ অভ্যাস বশত—নিজেকে সহজ করে তোলার জন্য। এরপরই সে কোন কিছু মনে রাখে না সে যা বলেছে। একজন মহিলার কাছে একজন পুরুষের সত্যি বলার চাইতে মিথ্যা বলার ধরন অনেক বেশি গ্রহণযোগ্য।
যদিও বলার তেমন কিছু ছিল না তবু সে তার পরিবর্তে তেমন কিছু মিথ্যার অবতারণা করেনি। তার একটা অন্য ধরণের জীবন ছিল। এখন সে সব শেষ। তারপর সে অন্য মানুষজনের সঙ্গে বসবাস শুরু করেছে সঙ্গে আছে অর্থের প্রাচুর্য। একই জায়গার বিশিষ্টদের সঙ্গে এবং অন্য জায়গার নতুন কারো সঙ্গে।
তোমার চিন্তাধারা সবকিছুই সত্যি অদ্ভুত, অপূর্ব। তুমি সবকিছু নিয়ে সন্দিত, সুন্দর তোমার ভেতরটা। তুমি ওভাবে কখনো খন্ড খন্ড হয়ে যাবে না। অন্যান্যরা যে ভাবে হয়। কাজের ব্যাপারে তোমার কোন ব্যস্ততা ছিল না। অথচ এখন তুমি অন্যরকম। কিন্তু তুমি নিজেই বলেছ মানুষদের নিয়ে তুমি লিখবে। বড় ধনীদের নিয়ে—যদিও তুমি তাদের দলের লোক নও। তবু ওদের সঙ্গে বাস করে সে লিখবে। কি লিখছে সে সম্পর্কে তার ধারণা থাকা প্রয়োজন। তথাপি সে কখনোই লিখতে পারেনি। প্রতিদিনই লেখা অসম্ভব এবং এই ভাবে না করতে করতে কর্মক্ষমতায় ভাটা পড়ে যায়। একসময় আর কোনো কাজ করার থাকে না। যে সব মানুষদের সে জানতো তারা সবাই ভাল ছিল—তার যখন কোন কাজ ছিল না। তার জীবনের সবচেয়ে ভাল সময় এই আফ্রিকাতেই কেটেছিল। কঠিন কোন ব্যাপার ছিল না। ছিল না জীবনের তেমন সৌখিনতা। কোন ভাবে সে এই কাজে নিযুক্ত থাকতে চায় আত্মার জন্য ঠিক যেভাবে একজন সৈনিক পাহাড়ের ওপরে উঠে যায় কাজ করার জন্য। এবং নিজেকে শিক্ষানবিশী করে তুলতে চায় শরীর থেকে বাইরে নিয়ে এসে জ্বালিয়ে দেয়ার জন্য।
মেয়েটি এ সব কিছু পছন্দ করে। সে নিজেই বলেছে সে এ সব ভালবাসে। উত্তেজনা ভরা সবকিছুই তার খুব ভাল লাগে। নতুন নতুন পরিবেশ দৃশ্য, মানুষজন। কিন্তু ছেলেটির ধাঁধা লাগে কাজ করার ক্ষমতার কথা ভেবে। কি করে এবং কি ভাবে কাজ শেষ হবে—সে জানে ভাল ভাবে। এটা কখনোই এই মেয়েটির দোষ নয়। এবং এটা যদি না ও হয় মেয়েটির অন্য একটি পাওয়া হবে। আর ছেলেটির অবস্থান যদি হয় মিথ্যার জগতে—তবে তার মৃত্যুবরণ করা উচিত। সে পর্বতের পেছনে একটি

গুলির শব্দ শুনতে পেল।
মেয়েটি সুন্দর গুলি ছুঁড়েছে, এই ভাল, এই ধনী কুত্তী এবং তার রক্ষনা-বেক্ষণ ছেলেটির প্রতিভার ধ্বংস করে দিচ্ছে। যত সব আজেবাজে কথা। সে নিজের প্রতিভা নিজেই ধ্বংস করে ফেলছে। কেন শুধু শুধু অযথা মেয়েটির দোষ ভাবছে। যেহেতু ওকে ও ভাল ভাবে রেখেছে? ছেলেটি নিজেই নিজেকে ক্রমশ ধ্বংস করে ফেলছে, অলসতা, মাত্রাধিক্য পানীয় গ্রহণ, ধীর এবং নিজেরই অতিরিক্ত চালাকিপনার জন্য। তাছাড়াও গর্ববোধ এবং সংস্কার'ত আছেই।
এ সমস্ত কি? একটি পুরনো পুস্তকের তালিকা? এ ছাড়া আর ওর প্রতিভা কি আছে? যদিও এটাকে প্রতিভা বলা যায় সে এর ব্যবহারের পরিবর্তে করেছে ব্যবসা। এরকম কখনই হয়নি সে যা করে ফেলেছে, সব সময়ই সে কি করতে চায়। এবং সব সময়ই সে বাঁচতে চেয়েছে অন্য কিছু নিয়ে—পেন এবং পেন্সিলের পরিবর্তে। এটা একটা আশ্চর্যের বিষয় যখনই সে অন্য কোন মেয়ের সঙ্গে প্রেমে পড়েছে, দেখা গেছে শেষ প্রেমিকার চেয়ে নতুন প্রেমিকার অর্থের সংস্থান অনেক বেশি। কিন্তু যখন সে আর কোন ভালবাসার মধ্যে রইল না, যখন সে শুধুমাত্র শুয়ে, এখন এই মেয়েটি যেমন আছে - এদের মধ্যে যার টাকা বেশি, যার কাছে ছিল সম্পূর্ণ টাকা, যার স্বামী ছিল শিশু ছিল। প্রেমিকও ছিল পরে তাদের সঙ্গে বিযুক্ত থাকে এবং এক-মাত্র যে তাকে ভালবাসে লেখক হিসেবে, মানুষ হিসেবে, সঙ্গী হিসেবে এবং গর্বিত বোধ করে। অথচ আশ্চর্যের বিষয় ছেলেটি তাকে একটুও ভালবাসে না। সব সময় শুয়ে থাকতে হয়। এখন সে মেয়েটিকে অনেক কিছুই দিতে পারবে টাকার জন্য, অন্তত সত্যিকারের ভালবাসার চাইতে বেশি।
আমরা যা করি তার সব কিছু থেকেই বিচ্ছিন্ন হওয়া উচিত, সে ভাবলো। যা হোক তোমার প্রতিভার সঙ্গে খাপ খাইয়ে জীবন ধারণ কর। সে তার বৈশিষ্ট্য বিকিয়ে দিয়েছে কোন এক প্রথায় কিংবা অন্য কোন ভাবে। তোমার জীবনের ভালবাসা যখন খুব বেশি ভাবে জড়ানো নয় তখন তোমার কাছে টাকার মূল্যবোধ অনেক বেশি। সে এ সবই উপলব্ধি করতে পেরেছে কিন্তু কখনো এ বিষয় নিয়ে লিখতে পারেনি। না, এ বিষয় নিয়ে সে লিখবে না, যদিও এটাই লেখার একটা অন্যতম বিষয়।
এখন দূর থেকে ওকে দেখা যাচ্ছে। খোলা আকাশের নীচে ও হেঁটে হেঁটে আসছে ক্যাম্পের দিকে। ওর পেছন পেছন আসছে ছেলে দুটো এবং সঙ্গে ঝোলানো টমি। ওর পরনে অশ্বারোহিনীর পোষাক, কাঁধে ঝোলানো রাইফেল। এখনো ওকে দারুণ সুন্দরী লাগছে। সুন্দর সুঠাম দেহ। ও মনে মনে চিন্তা করল। মেয়েটি একবারে অপরূপা নয় তবু ওর মুখশ্রী ভাল লাগে। প্রচুর পড়াশোনা করে, ঘোড়ায় চড়ে গুলি ছোঁড়া পছন্দ করে। ড্রিংকও করতে পারে যথেচ্ছ। ও যখন তরুণী ছিল ওর স্বামী মারা গেছে এর পরই ওকে সদ্যজাত দুই ছেলের ওপর মনোযোগ দিতে হয়েছিল। ও সাধারণত পড়তে ভালবাসে সন্ধ্যাবেলা ডিনারের আগে। পড়ার সময় ওর চাই স্কচ

এবং সোডা। ডিনারের সময় ও প্রায় সম্পূর্ণ মত্ত। ও সাধারণত বেশি ড্রিংক করে ঘুমনোর জন্য।
এ সমস্তই তাকে করতে হত প্রেমিক জোটার আগে। এরপর প্রেমিক জুটে গেলে সে আর বেশি ড্রিংক করত না। ঘুমনোর জন্য তার আর ড্রিংকে প্রয়োজন হত না। কিন্তু প্রেমিকরা তাকে ভীষণ ভাবে উত্যক্ত করে মারতো। তাই এদের মধ্যে একজন পুরুষকে বেছে সে বিয়ে করল যে তাকে আর জ্বালাতন করবে না।
এরপর এক প্লেন দুর্ঘটনায় তার এক ছেলের মৃত্যু হলে সে তার প্রেমিককে ছেড়ে দেয়। এমনকি তখন ড্রিংকও তাকে অবসাদ এনে দিতে পারে না। তাকে আবার নতুন করে জীবনের কথা ভাবতে হয়। হঠাৎ করে তাকে একা থাকার ভীষণ ভয়ে পেয়ে বসে। কিন্তু সত্যিকারের সে এমন একজনকে চায় যে তাকে সম্মান দেবে।
এর পরের ঘটনা শুরু হয় খুব সহজ ভাবে। মেয়েটির খুব পছন্দ হয় লেখকের লেখা। এবং হিংসে করতে থাকে লেখকের জীবনের কথা ভেবে। কিন্তু আস্তে আস্তে দুজনেই দুজনার প্রতি আকৃষ্ট হয়ে ওঠে। এর জন্য মেয়েটিকে ওর জীবনের মোড় অন্যভাবে ঘুরিয়ে নিতে হয়। লেখকও তার বাকি জীবনের সবটুকু ওকে উজার করে দেয়।
লেখক জীবনের সবকিছু উজাড় করে দেয় ওর নিরাপত্তার জন্য এবং আয়াসের জন্য'ও বটেই। এর মধ্যে অন্য কোন ধরনের প্রবঞ্চনা নেই। আর কিই বা থাকতে পারে? ওর কিছু জানা নেই। মেয়েটি লেখকের যা যা প্রয়োজন সব কিনে এনেছে। লেখক তা জানতো। সে একজন ভারি সুন্দর মহিলা, বিত্তবান, নম্র স্বভাবের, কখনোও কোন দৃশ্য তৈরী করে বসে না। এবং এখন এই জীবন নতুন করে যা তৈরী করল একটা জায়গায় এসে থেমে যাবে কেননা দু সপ্তাহ আগে ছবি তোলার জন্য যখন এগিয়ে যাচ্ছিল পুরুষটির হাঁটুতে কাটার আঁচড় লাগে। সেখানে কোন রকম আইয়োডিন ব্যবহার করা হয়নি। ছবি তোলার বিষয় ছিল একদল জন্তু। মাথা উঁচু করে ঘুরছিল। কিন্তু তাদের কানগুলো ছিল ছড়ানো। প্রথম শব্দ ওদের কানে প্রবেশ করা মাত্র ছুটে পালিয়ে যায় জঙ্গলের মধ্যে। ছবি তোলার আগে ওরা জঙ্গলের মধ্যে ঢুকে পড়ে।
সে একদম কাছে চলে এসেছে।
চৌকির ওপর লেখক মাথা ঘোরালো মেয়েটিকে দেখার জন্য, হ্যালো, সে বলল।
আমি একটা ছোট ভেড়া মেরেছি, মেয়েটি জানালো তাকে। সে তোমার জন্য তৈরী করে দেবে ডাল আর আমি আলু দিয়ে তৈরী করব অদ্ভুত ধরনের এক খাদ্য। এখন তোমার কেমন বোধ হচ্ছে?
—অনেক ভাল।
—নিশ্চয়ই অনেক সুন্দর। আমি যখন এখান থেকে যাই তুমি ঘুমোচ্ছিলে।
—সত্যি আমার খুব ভাল ঘুম হয়েছে। তুমি কি হেঁটে অনেক দূর গিয়েছিলে?

—না, পাহাড়ের পেছনে আশেপাশে। আমি কিন্তু খুব ভাল গুলি চালিয়েছি।
—তুমি জান তুমি ভাল গুলি চালিয়েছ।
—আমি ভালবাসি, আমি আফ্রিকা ভালবাসি। সত্যি। তুমি যদি সুস্থ থাকো তবে সেটা হবে আমার জীবনের পরম পাওয়া। তোমার সঙ্গে থেকে এই ধরনের শিকার এর আনন্দ—বলে বোঝাতে পারবো না। আমি এই দেশটাও ভালবাসি।
—আমিও ভালবাসি।
—ডার্লিং তুমি জানো না তোমায় এভাবে সুস্থ দেখে আমর কি অদ্ভুত লাগছে। আমি কিছুতেই তোমাকে অন্য অবস্থায় দেখলে সহ্য করতে পারি না। তুমি ওভাবে আর আমার সঙ্গে কথা বলবে না। প্রতিজ্ঞা কর? বল?
—না। সে বলল, আমি কিছুই মনে করতে পারছি না কি বলেছি।
—তুমি আমাকে আর ধ্বংস করে দিও না। করবে কি? আমি একজন মধ্যবয়স্কা মহিলা যে তোমাকে ভালবাসে এবং তুমি যা যা করতে চাও সেও তাই করতে ভালবাসে এরই মধ্যে আমি দু তিন বার ধ্বংস হয়ে গেছি। নতুন করে তুমি আর একবার আমায় ধ্বংস করো না?
—আমি তোমাকে বিছানায় কয়েকবারের জন্য ধ্বংস করতে চাই, পুরুষটি জানাল।
—হ্যাঁ, ওটাও ভাল ধরণের ধ্বংস। আর আমরা'ও ঐ ভাবেই নিজেদের ধ্বংস করে দিতে চাই। আগামী কাল এখানে প্লেন আসছে।
—তুমি কি করে জানলে?
—আমি নিশ্চিত। কাল আসতে বাধ্য। ছেলেদের এরই মধ্যে কাঠ জোগাড় হয়ে গেছে এবং ঘাস ও তার ওপরে প্রলেপ দেওয়ার জন্য। আমি আজ নিজে নেমে গিয়েছিলাম দেখার জন্য। ওখানে প্লেন ল্যান্ড করার জন্য যথেষ্ট জায়গা আছে।
—তুমি কি করে ভাবছো কালই আসবে?
—আমি নিশ্চিত কাল আসবে। এর মধ্যেই আসা উচিত ছিল। তারপর, শহরে ওরা তোমার পা ঠিক করে দেবে। আমরা নিজেদের ভালভাবে ধ্বংস করতে পারবো। ঠিক এইভাবে আজে বাজে কথা বলে নয়।
—আমরা কি আর একটু ড্রিংক করবো? সূর্য নিচের দিকে নেমে যাচ্ছে।
—তুমি কি মনে কর তোমার খাওয়া উচিত।
—আমার একটা খেতে ইচ্ছে করছে।
—আমরা দুজনে মিলে একটাই খাবো। মলো, লেট্টি ডুই হুইস্কি সোডা!
মহিলা চীৎকার করে বলল।
—আগে বরং তোমার মশক দানিটি খাটিয়ে নাও। সে তাকে বলল।
—টাঙাবো, দাঁড়াও আগে ধুয়ে আসি...
ক্রমশ চারদিক অন্ধকার হয়ে আসছে। ওরা ড্রিংক করল। এবং পুরোপুরি অন্ধকার হওয়ার আগে তারা দেখতে পেল একটা হায়না তাদের সামনের খোলা জায়গা দিয়ে

এধার থেকে ওধারে যাচ্ছে।

—এই বেজম্মাটা রোজ রাতে এখান দিয়ে যায়। পুরুষটি জানালো, রোজ রাতে দু সপ্তাহ ধরে।

—ওই বোধহয় প্রতি রাতে শব্দ করে। আমি অবশ্য মনে কিছু করি না। ওরা নিম্ন শ্রেণীর জন্তু।

দুজনেই এক সঙ্গে ড্রিংক করল। এখন তেমন কোন ব্যাথা নেই শুধু একভাবে শুয়ে থাকার অসুবিধে ছাড়া। ছেলেটি বাইরে আগুন জ্বালাচ্ছে। তার ছায়া এসে পাড়ছে তাবুতে। সে জীবনের এই মৌনতা ভরা সমপর্ণের অর্থ বুঝতে পারছে। মহিলা তার কাছে অতি প্রিয়। বিকেলের সেই নির্দয় ব্যবহারে অনুতপ্ত। এরকম সুন্দর মহিলা সে সত্যি কখনো এর আগে দ্যাখেনি। কিন্তু তার একটু পরের ঘটনা একদম অন্যরকম। সে প্রায় মরতে যাচ্ছিল।

হঠাৎ কি যেন ছুটে এল ; জলের স্রোতের মত নয় কিংবা হাওয়ার বেগের মত ' কিংবা হঠাৎ কোন অশুভ গন্ধ মুহূর্তের মধ্যে মনে হল যেন হায়নাটা ধার দিয়ে পিছলে চলে গেল।

—ওটা কি হ্যারি ? মহিলা জিজ্ঞেস করল।

—কিছু না, সে বলল। অন্য দিকে যাওয়ার জন্য ভাল শুরু পেয়েছো বাতাস ঐ দিকে বইছে।

—মলো তোমার বান্ডেজ পাল্টে দিয়েছে ?

—হ্যাঁ, আমি এখন বরিক লাগাচ্ছি।

—কেমন লাগছে তোমার এখন ?

—একটু ভাল।

—আমি স্নানে যাচ্ছি, মহিলা জানালো। যাবো আর আসবো। দুজনে একসঙ্গে খাবো তারপর চৌকিটা নিয়ে আসবো ভিতরে।

সুতরাং সে মনে বলল, দুজেনের মধ্যে বচসা থামিয়ে খুব ভাল করেছি। সে কখনো আর এই মহিলার সঙ্গে ঝগড়া করবে না। সে প্রচণ্ড ভালবাসে ওকে তাই আবার ঝগড়া ও হয় খুব বেশি এবং শেষ পর্যন্ত ভালবাসে। তাই চাওয়া ও অনেক বেশি এবং খুইয়ে দেয় সবকিছু।

সে একা একা কনস্ট্যানটিনোপলে থাকার দিনগুলোর কথা মনে করে। এখান থেকে বেরিয়ে যাওয়ার আগে প্যারিসে ঝগড়া করেছিল। সে চেয়েছিল সমস্ত ক্ষণটা জমিয়ে রাখতে, কিন্তু তা অতিক্রান্ত হলে, তার একাকীত্বকে হত্যা করতে অসমর্থ হয়। পরিস্থিতি আরো খারাপ হয়ে যায়। সে লিখেছিল মহিলাকে, যে তাকে ছেড়ে গিয়েছে, সে কিছুতেই ঐ পরিস্থিতিকে হত্যা করতে পারে নি। এরপর ওর সম্পর্কে চিন্তা করে ওকে দেখতে পেয়েছিল রেগিন্সের বাইরে তাকে কবে তুলছিল স্মৃতি বিভ্রম আর ভেতরে

দুর্বল। এবং তারপর অন্য একজন মহিলাকে দেখে তার বার বার অতি-পরিচিত কাজের জন মনে হচ্ছিল কিন্তু বুলেভার্দ-এর পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় বুঝল এর সঙ্গে তার কোন সম্পর্কই নেই। কিভাবে এবং কি সেই মহিলা করেছিল তা কোন ব্যাপার নয় যেহেতু সে জানতো কোন ভাবেই নিজেকে সারিয়ে তুলতে পারবে না তাকে ভালবেসে। সে ক্লাবে লিখেছিল এই চিঠিটি, কোল্ড সোবারে বসে, তারপর পোস্ট করে দিয়েছিল নিউইয়র্কের জন্য। তাতে উত্তর পাঠানোর ঠিকানা ছিল প্যারিস অফিসের। এবং এইটাই অনেক নির্ভরযোগ্য মনে হয়েছে। আর সেই রাতে মহিলাকে হারিয়ে তার বার বার মনে হয়েছে যেন তার ভেতরটা শূন্য ফাপা কিছু নেই। সে বিস্মিত হয়ে ট্যাক্সিসতে সময় কাটাতে যেয়ে একটি মেয়েকে বেছে নেয় ওখান থেকে, পরে ওকে নিয়েই সাপার যায়। নেচেও ছিল ওর সঙ্গে। কিন্তু অত্যন্ত কুৎসিত নাচ। গানার বাইরে এসে জানতে ওর সঙ্গে রাস্তায় মারপিট হয় অন্ধকারে। এর মধ্যে সে দুবার আঘাত করতে পারতো কিন্তু তা না করে যখন অপেক্ষা করছিল। সেই সময় গানার তার শরীরে আঘাত করে এবং চোখের পাশে। উঠে দাঁড়াতে গেলে ঝাঁপিয়ে পড়ে শরীরের ওপর, কোট টানে, হাত ছিড়ে যায়। এরপর ঝটাপট উঠে গানার মেয়েটিকে নিয়ে পালাতে চায়। কারণ ততক্ষণে খবর ছড়িয়ে পড়েছে – মিলিটারী পুলিশ আসছে। কিছুটা রাত কাটানোর পর মেয়েটি চোখ খোলার আগে সে সেখান থেকে পালিযে গিয়েছিল। দিনের আলোতে মেয়েটিকে খুবই ক্লান্ত দেখাচ্ছিল। ওর হাতে ছিল সেই কোটটি যার একটা হাত হারিয়ে গিয়েছিল।

ঠিক সেই রাতেই সে অবার অ্যানাটোলিয়ার দিকে রওনা হয়েছিল – সব মনে পড়েছে। তারপর দিন এই যাত্রা সারা দিন ধরে মাঠের ওপর দিয়ে বিভিন্ন ক্ষেতের মাঝখান দিয়ে নিয়ে গিয়েছিল বিশেষ জায়গায়। যেখানে কনস্ট্যান টাইন অফিসারকে আক্রান্ত হতে হয়েছিল।

এইটা সেই দিন যেদিন সে মৃত মানুষের দেখেছিল তাদের পরনে ছিল সাদা স্কার্ট জুতোগুলো উল্টোনো। বীরভাবে ট্রাকটি এসেছিল সবকিছু নিয়ে এবং সে দেখতে পেয়েছিল স্কার্ট পরা মানুষদের, তারা দৌড়চ্ছিল আর অফিসাররা গুলি ছুড়ছিল তাদের লক্ষ্য করে। এরপর সে যে দৃশ্য দেখেছিল তা চিন্তার বাইরে এবং কল্পনাতীত খারাপ। তাই প্যারিসে ফিরে এসে সে সম্পর্কে কোন কথা বলতে পারেনি। এবং সেখানে কাফেতে একজন আমেরিকান কবি বোকা বোকা দেখতে—বলে চলেছিল রুমানিয়ার সঙ্গে দাদা সংঘর্ষ নিয়ে। তার নাম ছিল ট্রিসটান জারা, মাথা ধরা আর বিমর্ষতা ছিল তার রোগ এবং পেছনের অ্যাপার্টমেন্টে তার স্ত্রী যাকে আবার

সে নতুন করে ভালবাসছে। এখন আর কোন ঝগড়া নেই। পাগলামির শেষ—এখন বাড়ি ফিরতে পারলে আনন্দ। অফিস তার মেইলটি বাড়ির ঠিকানায় পোস্ট করে দিল। একদিন জোরে কারো লেখা উত্তর সে পেল। হাতের লেখা দেখা মাত্র তার সমস্ত শরীর হিম। সে তৎক্ষণাৎ চিঠিটা অন্য চিঠির তলায় রেখে দিল। তার স্ত্রী দেখতে পেয়ে জানতে চায়, চিঠিটা কে লিখেছে গো? এবং এটাই ছিল শুরু হওয়ার শেষ অধ্যায়।

তাদের সঙ্গে থাকার ভাল সময়ের কথাগুলো তার মনে আছে, এবং ঝগড়ার কথাও। ঝগড়া করার জন্য তারা সবসময় ভাল জায়গা বেছে নিত। ভাল জায়গায় এসে তারা এরকম ঝগড়া করতো কেন? সে এসমস্ত কিছুই লেখেনি, কেননা প্রথমে সে কাউকে আঘাত করতে চায়নি এবং মনে করেছিল এ ছাড়া অনেক কিছু আছে লেখার জন্য। ও সবসময় ভাবতো একবারেই সে সবকিছু লিখবে। লেখার প্রচুর জিনিস আছে। পৃথিবীর ক্রমশ পরিবর্তন হচ্ছে, শুধুমাত্র বিষয়েই নয়। সে লক্ষ্য করেছে মানুষজন। কি ভাবে বিভিন্ন সময়ে এর পরিবর্তন ঘটেছে। তার কর্তব্য এসমস্ত জিনিস নিয়েই লেখা। কিন্তু এখন সে আর পারবে না।

—তোমার কেমন লাগছে এখন? মহিলা স্নান সেরে তাবু থেকে বেরিয়ে এল।

—ভাল।

—খেতে পারবে এখন? সে দেখতে পেল মহিলার পেছনে মলো এবং অন্য ছেলেটা। তারা খাচ্ছে।

—আমি লিখতে চাই, সে বলল।

—কিছু খাও তা না হলে শক্তি পাবে কি করে?

—আমি নিশ্চয়ই আজ রাতে মারা যাবো। সে বলল, আমার আর শক্তি বাড়িয়ে কি হবে।

—হ্যারি, দয়া করে অতটা মেলোড্র্যামেটিক হয়ো না! মহিলা বলল।

—তুমি তোমার নাক ব্যবহার করছনা কেন? আমার উরুর অর্ধেক পচে গেছে। শুধু শুধু শক্তি বাড়িয়ে কি হবে? মলো, হুইসকি সোডা নিয়ে আয়।

—লক্ষ্মীটি শুধু ঝোল খাও। মহিলা খুব আস্তে বলল কথাগুলো।

—ঠিক আছে।

খুব গরম ঝোল। সে একটা কাপে ঢেলে ঠান্ডা হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করলো; তারপর ঢক ঢক করে গিলে খেয়ে ফেলল।

—তুমি সত্যি একটা সুন্দর মেয়ে, সে জানালো, আমার দিকে একটুও তাকাও না। মহিলা তাকালো ওর দিকে। সেই অতি পরিচিত চাউনি। ভালবাসার সেই প্রিয়

মুখ শহর এবং গ্রামের। ত্রুটি যেটুকু তা হচ্ছে ড্রিংক নিয়ে বিছানার ব্যাপারে। কিন্তু শহর কিংবা গ্রাম কখনোই ভাল বুক এবং প্রয়োজনীয় থাই দেখাতে পারে নি। সে তাকালো তার প্রিয় সুন্দরীর দিকে—ও হাসছে। ওর মনে হল যেন মৃত্যু আবার এসেছে। এখন আর ততটা ব্যস্ততা নেই। একা শুধু মাত্র হাল্কা ছোঁয়া। যেন হাওয়ায় মোমের আলো কাঁপছে আর ক্রমশ লম্বা হচ্ছে তার শিখা।

—ওরা আমার মশারিটা এনে উঁচু গাছের ডালে বেঁধে দিয়েছিল তার পাশে জ্বালিয়েছিল আগুন। আমি কোন মতেই আজ আর টেনটের মধ্যে যাচ্ছি না। আমার বেশি নড়াচড়া ভালনয়। আজ পরিষ্কার রাত। বৃষ্টি হওয়ার কোন রকমেই সম্ভাবনা নেই।

এই হচ্ছে ব্যাপার তুমি যে ভাবে মারা গিয়েছিলে। কানে কানে কথা বলার জন্য তুমি কিছুই শুনতে পাওনি। ভালো, আর কোন রকমের ঝগড়া করা নয়। সে প্রতিজ্ঞা করল। তার যা অভিজ্ঞতা হয়েছে সে তা কোনমতেই নষ্ট হতে দিতে চায় না। সম্ভবত সে করবেও তাই। তুমি সবকিছু নষ্ট করে দিয়েছ। কিন্তু সে কিছুই করতে পারবে না।

—তুমি ডিকটেশন নিতে পারো না, পারো কি?

—আমি শিখি নি, মেয়েটি বলল তাকে।

—ঠিক আছে।

আর সময় নেই, তুমি ইচ্ছে করলে সম্পূর্ণ বক্তব্যটা একটা পংক্তিতে লিখে দিতে পারো, এবং যদি সেটা ঠিক হয়।

একটা কাঠের গুঁড়ির ঘর ছিল, গোল সাদা গোলা বারুদে ভরা হ্রদের পাশে পাহাড়ের ওপর। ঘরের দরজায় একটা ঘণ্টা আছে। তা বাজিয়ে সবাইকে খেতে ডাকা হয়। ঘরের পেছনে আছে একটা মাঠ আর মাঠের পেছনে কাঠ। লম্বার্ডি প্রদেশের মানুষরা লাইন করে দাঁড়িয়েছিল ঘর থেকে বন্দর পর্যন্ত। অন্যরা দৌড়ে গিয়েছিল বিন্দুর ধার পর্যন্ত। একটি পথ পাহাড়ের ওপর উঠে গেছে কাঠগুলোর পাশ দিয়ে এবং সেই পথের পাশে সে কুড়িয়ে পেয়েছিল কালো জাম। একদিন কাঠের ঘরে আগুন ধরে যায়। পুড়ে যায় সমস্ত গোলা বারুদ বন্দুক। সীসে লোহার কেটলি। সবকিছু পুড়ে হয়ে যায় ছাইয়ের স্তূপ। তুমি তোমার দাদুকে জিজ্ঞেস করেছিলে তুমি ঐগুলো নিয়ে খেলবে কিনা। সে উত্তর দিয়েছিল, না। কয়েক দিনের মধ্যে ঐখানে আবার ঘর তৈরী করা হয়। এবং ঠিক একই ভাবে সাদা রঙ করা হয় ঘরটি। তবে এবারে ভেতরে আর কোন বন্দুক ছিল না। ছাই পাহাড়ের ছিল তখনো। তাই কেউ আর ছুঁত না।

যুদ্ধের পর কালো জঙ্গলের মধ্যে আমরা মাছ শিকারের একটা স্রোত ভাড়া করেছিলাম। ওখানে যাওয়ার জন্য দুটি আলাদা আলাদা পথ রয়েছে। একটা পথ গেছে উপত্যকার নিচ দিয়ে। পথের দুধারে ছোট ছোট ফার্ম। পথ যেখানে স্রোতের কাছাকাছি পেঁছেছে সেখান থেকেই মাছ শিকারের জায়গা।
অন্য পথটি সোজা উঠেছে ওপরে, খাড়াই। পাইন বনের মধ্য দিয়ে। এখানে একটি হোটেল আছে—তৃবার্গ। আমরা হোটেলের মালিকের সবাই বন্ধু ছিলাম। গত বছরটা তার খুব ভাল সময় গেছে। পয়সা কড়ি করেছিল কিছু। কিন্তু এ বছর সেই তুলনায় খুবই খারাপ। মুদ্রাস্ফীতি দেখা দিয়েছে। গত বারের সেই পয়সা দিয়ে সে কোনমতেই এবার আর হোটেল খুলতে পারেনি শেষে দুঃখে নিজেই ফাঁসিতে ঝুলছে।
এ সমস্তই তুমি খেয়াল করতে পারবে। কিন্তু তুমি ঐ জায়গা সম্পর্কে কিছুই বলতে পারবে না, যেখানে ফুল বিক্রেতা রাস্তার ওপর তার ফুল রঙ করে। অটোবাস যেখান থেকে ছাড়ে সেখানে বসে বৃদ্ধ কিংবা বৃদ্ধারা মদ খেয়ে চুর হয়ে বসে থাকে। শিশুরা ঠাণ্ডার মধ্যে দৌড়তে থাকে তাদের নাক খোলা থাকে। নোংরা এবং ভেজার দুর্গন্ধ দারিদ্রের ছোয়া এবং মত্ততা এ নিয়ে কাফে দেশ এবং বাল মুসেট্টির জারজ সন্তান বাস করত এর ওপরে। লজে যে গ্রেড রিপাব্লিকিয়ান সৈন্যদের পাটি দিয়েছিল তার ঘোড়ার লোম দিয়ে মোড়া হয়েছিল একটি চেয়ার। ঘরের কোণাকুণি যে মহিলা বসেছিলেন তার স্বামী একজন বাইসাইকেল রেসার। আজ ভোরের কাগজ খুলে তাঁর আনন্দ আর ধরে না। তাঁর স্বামী প্যারিস ট্যুরে তৃতীয় স্থান অধিকার করেছে। আর যার স্বামী ট্যাক্সি চালায় সে একবার হ্যারিকে ভোরের প্লেন ধরিয়ে দেওয়ার জন্য দরজায় টোকা মেরে জাগিয়ে দিয়েছিল। যাত্রা শুরু করার আগে তার সঙ্গে বসে ড্রিংক করেছিল সেই সকালে। সে জানতো এই কোয়াটারের প্রতিবেশীরা প্রায় সকলেই গরীব।
এই জায়গার চার পাশে যারা বাস করতো তারা দুধরনের মদ্যপ এবং খেলোয়াড়। মদ্যপারা হত্যা করেছিল তাদের দারিদ্রতাকে। খেলোয়াড়রা বাঁচতো ব্যায়াম করে। এরা সকলেই কমাণ্ডার্সের বংশধর খুব সহজেই এরা তাদের বাঁচার রাজনীতি আয়ত্ত করে নিতে পারতো। তারা ভাল ভাবেই জানতো কে তাদের বাবাকে মেরেছে, তাদের আত্মীয় স্বজন, ভাই এবং বন্ধুকে মেরেছে। এই দারিদ্রতার মধ্যে এবং রাস্তার পাশের এই কোয়ার্টারে বোচেরী চিভোলাইন থেকে ওয়াইন কো অপারেটিভ পর্যন্ত, সে লিখেছিল তাকে কি করতে হত। প্যারিসের মধ্যে এ জায়গাই ছিল তার সবচেয়ে প্রিয়। এ রকম আর দ্বিতীয় কোন জায়গা তার মন কেড়ে নিতে পারেনি।

বড় বড় ঝাকড়ানো গাছ, সাদা প্লাস্টার করা পুরনো বাড়ীর নিচের দিকে বাদামী রঙ। রাউণ্ড স্কোয়ারে সবুজ রঙ করা অটো বাস স্ট্যাণ্ড। তার ওপরে বেগুনী রঙের ফুলের সমারোহ। এখান দিয়ে অ্যাসফেল্টে মোড়া আঁকা বাঁকা রাস্তা উঠে গেছে ওপর দিকে। এর ওপর দিয়ে সাইকেল চালাতে ওর খুব ভাল লাগতো। এখানকারই একটি সাধারণ উঁচু হোটেলে পল ভারলেইন মারা গিয়েছিল। ও যে অ্যাপার্টমেন্টে ছিল তার দুখানা ঘর। তার ওপরে ছিল আর একখানি ঘর। হোটেলের সবচেয়ে উঁচুতে ছিল এই ঘরখানি। ভাড়া মাসে ষাট ফ্র্যানসিস্। এখানেই বসে ওর লেখা সারতো। আর জানলা দিয়ে তাকালে দেখতে পেত অন্যান্য বাড়ির ছাদ, চিমনী এবং প্যারিসের সমস্ত পর্বত।
অ্যাপার্টমেন্ট থেকে তুমি শুধু দেখতে পাবে জঙ্গল এবং কয়লাখনির মানুষদের বাসস্থান। সে মদও বিক্রী করত, খারাপ মদ। এখানে সর্বত্রই মদ বিক্রী হয়। প্রতিবেশীদের জানলায়, রাস্তায় প্লাস্টার দেওয়ালের পাশে এবং সবুজ রং করা কো অপারিটেভের সামনে। রাতে কেউ কেউ মত্ত অবস্থায় পড়ে থাকে। তাদের মুখ দিয়ে তখন অদ্ভুত অদ্ভুত শব্দ বেরুতে থাকে। জানলা খুললে সেই শব্দ স্পষ্ট শোনা যেতে থাকে।
—পুলিশ কোথায়? যখন তুমি চাইবে না তখনই শালা তোমার সামনে এসে দাঁড়াবে। ও শালা নিশ্চয়ই খারাপ মেয়ে নিয়ে শোয়। এই দালাল, শা……কেউ কেউ তখন জানালা দিয়ে বালতি ভরে জল ছুঁড়ে দেয়। অদ্ভুত ধরনের শব্দগুলো একটুক্ষণ থেমে আবার শুরু হয়।
—ওটা কি? জল। খুব বুদ্ধিমানের কাজ। এরপর জানালা বন্ধ হয়ে যায়। মেরী তার স্বামীকে প্রতিবাদ জানায়। একজন স্বামী যদি সন্ধ্যা ছ'টা পর্যন্ত কাজ করে এবং বাড়ি ফেরার সময় অল্প ড্রিংক করে তাতে তেমন ক্ষতি হয় না। কিন্তু সে যদি পাঁচটা পর্যন্ত কাজ করে এবং প্রতি রাতে মাতাল হয় তাহলে টাকা পয়সা যেমন থাকে না তেমনি তার স্ত্রীকে হারাতে হয় মূল্যবান সেই কম সময়ের সঙ্গটুকুও।

—তুমি আর একটু ঝোল খেতে? মহিলাটি জিজ্ঞেস করে
—না, তোমাকে অনেক ধন্যবাদ। ভীষণ ভাল তুমি।
—আর একটু খাও।
—তার চেয়ে আমায় একটু হুইস্কি-সোডা দাও।
—এটা তোমার পক্ষে মোটেও ভাল নয়।

—না, এটা আমার পক্ষে খারাপ। কোল পর্টার এই শব্দগুলো লিখেছিল আর গান। এই মাত্র তুমি জ্ঞান আমায় দিলে।

—তুমি জানো তোমার ড্রিংক করা আমি পছন্দ করি।

—ও হ্যাঁ। শুধু আমার জন্য এটা খারাপ।

মহিলা চলে গেলে আমি যা যা চাই সব নেব। সে চিন্তা করতে থাকে। শুধু আমি যা চাই না ওখানে যা আছে সব। এখন সে খুব ক্লান্ত। খুব ক্লান্ত। কিছুক্ষণের জন্য সে ঘুমোবে। সে যখন ঘুমোবে মৃত্যু সেখানে থাকবে না। সে নিশ্চয়ই অন্য কোন রাস্তা ধরে চলে গেছে। হয়তো প্যারিস। বাইসাইকেলে চড়ে। কিংবা সে চলে যাচ্ছে নিঃশব্দে প্রস্তর ফলকের ওপর দিয়ে।

না সে প্যারিস সম্পর্কে কোন কিছু লেখেনি কখনো। প্যারিসকে সে ভ্রূক্ষেপও করত না। কিন্তু অন্য কি বাকি রয়ে গেল যা নিয়ে কখনো সে লেখেনি? চাষের গভীর খাদের মধ্যে পরিষ্কার জল, আলফা আলফার গভীর সবুজতা কিংবা র‍্যাঞ্চ বা সাদায় ধূসরে মেশানো রাশ—এদের সম্পর্কে কোন লেখা। পাহাড়ের সরু পথ বেয়ে উঠে গেছে জন্তুর দল। গরুর দল গ্রীষ্মে লজ্জায় হরিণের মত হয়ে আছে। পাহাড়ের পেছন দিকে বেলা শেষের আলোতে স্পষ্ট দেখা যায় চুড়া, চাঁদের আলোয় জন্তুর দল নিচে নামতে থাকে। উপত্যকার ওপর আলোময় হয়ে যায়। এখন তার মনে পড়ে জঙ্গল থেকে অন্ধকারে ঘোড়ার লেজ ধরে নেমে আসার কথা। যখন তুমি কিছু দেখতে পাবেনা—এই সমস্ত গল্পের কথা তার লিখতে ইচ্ছে করে।

কিছু কিছু হাসির কথা ওর মনে পড়ে। সেই ছেলেটি যার কাছে ছিল র‍্যাঞ্চ এবং বলেছিল এ ব্যাপারে কেউ যেন কোন কিছু জানতে না পারে। আর সেই বেজম্মা বৃদ্ধ তাকে খুব করে পিটিয়েছিল অথচ সে বৃদ্ধকে সাহায্য করার জন্য কাজ বন্ধ রেখে গিয়েছিল। ছেলেটি সঙ্গে সঙ্গে রান্না ঘরে ঢুকে রাইফেল বার করে এনে বৃদ্ধকে ছুড়েছিল গুলি। ঠান্ডায় জমে যাওয়া বৃদ্ধের দেহের কিছু অংশ কুকুর খেয়ে ফেলেছিল। বাকি অংশটুকু তোমরা দুজনে ভাল করে জড়িয়ে এনে ষাট মাইল দূরে স্কী করার পথে এনে ফেলে দিয়েছিলে। ছেলেটির কোন ধারণা ছিল না সে এ্যারেস্ট হবে। কেননা ও ভালোর জন্য এ কাজে ব্রতী হয়েছে। কিন্তু শেষে ওর হাতে যখন হাত কড়া পড়লো তখনো ও বিশ্বাস করতে পারছিল না। তারপর সে কাঁদতে শুরু করলো। এই একটি গল্প সে এখনো বাঁচিয়ে রেখেছে

লেখার জন্য। অন্তত এই রকম কুড়িখানা গল্প ওর জানাছিল, কিন্তু একটাও সে লিখতে পারেনি এখনো। কেন ?

—তুমি ওদের বলে দিও কেন, সে বলল।
—কি, কি হয়েছে লক্ষীটি ?
—কি হয় নি।

মহিলা খুব বেশি ড্রিংক করেনি এখন। যেহেতু সে তার কাছে আছে। কিন্তু সে যদি বেঁচেও থাকে তাহলে ও ওর সম্পর্কে কিছু লিখবে না। তা মহিলা জানে। এবং তাদের কারো সম্পর্কে নয়। ধনীরা হয় নিষ্প্রভ প্রচুর মদ খায় কিংবা তারা ভীষণ ভাবে খেলে ব্যাকগ্যামন। তারা একঘেয়ে এবং অনুকরণ করতে অভ্যস্ত। তার মনে পড়ে থাকে গরীব জুলিয়ানের জন্য, তার রোমাঞ্চকর জীবন। সে একটি গল্প লিখেছিল, তার শুরু হয়েছিল এই ভাবে, খুব ধনীরা তোমার এবং আমার থেকে আলাদা হয়। এবং একজন কি ভাবে যেন জুলিয়ানকে বলেছিল, হ্যাঁ তাদের অনেক টাকা আছে। এটা জুলিয়ানের প্রতি কোন রসিকতা নয়। সে ভেবেছিল তারা বুঝি বিশেষ ধরনের জাতি কিন্তু যখন সে বুঝতে পেরেছিল তারা ঠিক তা নয় তখনই তার হয়েছিল বিনাশ। এরকম ভাবে ধ্বংস তার বোধ হয় আর কখনো হয়নি।
সে দুর্বলকে অবজ্ঞা করবে। তোমাকে পছন্দ করতে হবে না কেননা তুমি এর সবটুকুই জানো। সে যে কোন জিনিষকে চাপকাতে পারে, সে ভাবলো কোন কিছুই তাকে আঘাত করতে পারবে না যদি সে সম্পর্কে কিছু না ভাবে।
ঠিক আছে। এখন সে তাই মৃত্যুকেও ভ্রূক্ষেপ করবে না। একটা জিনিসই তাকে ভীষণ ভাবে কাহিল করে দিচ্ছে—তা হচ্ছে ব্যথা। সে ব্যথা সহ্য করতে পারে। যদি না তা অনেকক্ষণ ধরে চলতে থাকে, এবং তাকে ক্ষয়িত করতে থাকে কিন্তু এখানে অন্য একটা জিনিষ তাকে ভীষণ ভাবে আঘাত করে। ওর মনে হয় যখন সে পুরো পুরি ভেঙ্গে পড়ছে - ব্যথা তখন থেমে যায়।

অনেকদিন আগের কথা তার মনে পড়ে। উইলিয়ামসন তখন ছিল বম্বিং অফিসার। জার্মানে কেউ একজন বোমার লাঠি দিয়ে আঘাত করেছিল এবং যেই মুহূর্তে সে আসছিল সেখানে ছুঁড়ে দেওয়া হয়েছিল পেট্রোল, মুহূর্তের মধ্যে দুর্ঘটনা। অর্ধমৃত সেই অফিসার সেই রাতে ভিক্ষে চেয়েছিল সবার কাছে তাকে যেন হত্যা করে ফেলা হয়। সে ছিল একজন মোটা মানুষ। খুব সাহসী। একজন সৎ অফিসার। তারা যখন তাকে ভেতরে নিয়ে এল তখনও সে জীবিত ছিল। তার থেকে কেটে তাকে

আলাদা করতে হয়েছিল। গুলি কর, হ্যারি। খ্রীস্টের দোহাই গুলি কর আমাকে। আজ উইলিয়ামসনের কথা বার বার মনে পড়ছে আর সেই রাতের কথা। এই ব্যাপারে তর্ক হয়েছিল,—প্রভু এমন কাউকে পৃথিবীতে পাঠায় না যার সহ্য করার ক্ষমতা নেই। কারো কারো মতে ব্যথা একসময় আসে এবং আপনা আপনি আবার একসময় শেষ হয়ে যায়।

এখনো তেমনি আছে। যেমন তার ছিল, খুব সহজ। এভাবে যদি চলে তাহলে চিন্তার তেমন কিছু নেই। ঐ কথা না ভাবলে সেও এখন ভাল সঙ্গ নিয়েই আছে। সে তার সঙ্গিনী সম্পর্কে স্বভাবসিদ্ধ ভাবলো।
না, সে চিন্তা করছে। যখন তুমি সবটুকু করেছ তখন বাকিটুকু অনেকক্ষণ ধরে করে চলো। কোন মানুষকে এখন এখানে আশা করা অসম্ভব।
সবাই চলে গেছে। পার্টি শেষ হয়ে গেছে। তুমি এখন রয়েছে তোমার তত্ত্বাবধই-কার সঙ্গে।
আমি এখন অন্যান্য সবকিছুর মত মৃত্যু নিয়েও ভীষণ একঘেয়ে বোধ করছি।
সে চীৎকার করে বলল, সব বাজে।
—কি বলছো, লক্ষ্মীটি ?
—তুমি যাই কর ভীষণ সময় নাও।
সে তার মুখের দিকে তাকালো। অন্যপাশে আগুণ জ্বলছে। মহিলা চেয়ারে ভাল করে হেলান দিয়ে বসলো। আগুনের আলো পড়ে ওর মুখ উজ্জ্বল দেখাচ্ছে। ওর চোখে ঘুম ঘুম ভাব। কাছেই আগুনের ওপাশে হায়না শব্দ করে চলেছে।
—আমি লিখতে চাইছিলাম, সে বলল, কিন্তু ভীষণ ক্লান্ত লাগছে।
— তুমি ঘুমোতে পারবে'ত ?
—নিসন্দেহে। তুমি কেন ভেতরে যাচ্ছো না ?
—আমি এখানে তোমার সামনে বসে থাকতে চাই।
সে মহিলাকে জিজ্ঞেস করল, তোমার কি কোন ব্যাপারে অবাক লাগছে ?
—না, শুধু একটু ঘুম পাচ্ছে।
—আমারও তাই। সে বলল।
তার আবার মনে হল যেন মৃত্যু এসে পাশে দাঁড়িয়েছে।
—তুমি জান আমার এই অনুসন্ধিৎসা কখনো হারাবো না। সে মহিলাকে জানালো।
—তুমি কখনোই কোনো কিছু হারাও নি। তুমি একজন স্বয়ং সম্পূর্ণ মানুষ।
—হায় যীশু! সে বলল, একটি মেয়েমানুষ কত কম জানে। কি বললে তুমি ?

তোমার অনুমান ?

কারণ, একটু পরেই মৃত্যু এসে তার মাথার কাছে অপেক্ষা করতে লাগলো। তার চৌকির একদম পাশে। সে মৃত্যুর নিশ্বাস অনুভব করতে পারছে।

—কাস্তে কিংবা করোটি, কোনটাই বিশ্বাস করো না। সে বলল মহিলাকে, এটা খুব সহজ ভাবেই দুটো বাইসাইকেল পুলিশ ম্যান হতে পারে কিংবা পাখি অথবা এটা একটা উচ্চৈস্বরে চীৎকার হতে পারে হায়নার মতো।

ক্রমশ আস্তে আস্তে তার শরীরে উঠে আসছে এখন। কিন্তু এর কোন আকার নেই। শুধু মাত্র জায়গা দখল করে থাকতে পারে।

—ওকে চলে যেত বল।

কিন্তু গেল না, আরো কাছাকাছি এল যেন।

—তোমার প্রচণ্ড এক নিশ্বাস আছে, সে বলে উঠলো, এই বেজন্মা কোথাকার।

এ যেন আরো অনেক কাছে চলে এলো ওর। একদম কাছে। সে আর কথা বলতে পারছো না। সে যখন দেখল ও কথা বলতে পারছে না আরো কাছে এল সে। এবং এখন কোন কথা না বলেই পাঠিয়ে দিতে চাইছে। সে এমন ভাবে কাছে এল যেন সমস্ত ওজনটাই বুকের ওপর পড়ে। এখন সে গড়তেও পারছে না, কথা বলতেও ও পারছে না। শুধু শুনতে পাচ্ছে মহিলা বলে চলেছে, বাওনা ঘুমিয়ে পড়েছে। চৌকিটা আস্তে আস্তে ধরে তাঁবুর মধ্যে ঢুকিয়ে দে।

সে কোন কথা বলতে পারছে না। তা না হলে মহিলাকে বলত যে ভাবে আছে এই ভাবেই থাকতে দাও। সে নিশ্বাস নিতে পারছে না। তারপর যখন তারা চৌকিটা তুলল, সবই ঠিক ছিল হঠাৎ মনে হল বুকের কাছ থেকে ভারটা বেশি করে পড়ছে। তখন সকাল। কিছুক্ষণ থেকে একটা প্লেন মাথার ওপর ঘুরছে তার শব্দ সে শুনতে পেল। ছেলেরা দৌড়ে গিয়ে কেরাসিন দিয়ে আগুন ধরাল। ভোরের বাতাসে আগুনের ধোঁয়া তাঁবুর কাছে উড়ে আসছে। প্লেনটা আর দুবার পাক খেলো। তারপর খুব সহজ ভাবে নিচে নেমে এসে দাঁড়ালো। বৃদ্ধ কম্পটন ছিলেন প্লেনে হেঁটে এসে তার পাশে দাঁড়ালো। ওর পরনে ছিল টুইডের জ্যাকেট মাথায় বাদামী রঙের টুপি।

—কি ব্যাপার, ওল্ড কক ? কম্পটন বলল।

—পায়ে ব্যাথা, সে তাকে বললো, কিছু জল খাবার খাবে ?

—ধন্যবাদ, এই মাত্র আমি চা খেলাম। তুমি'ত জান আমি পুষমথ নিয়ে এসেছি। তুমি ছাড়া এই প্লেনে কাউকে নিয়ে যাওয়া যাবে না। তোমার লরি পথে আসছে।

হেলেন কম্পনকে এক ধারে নিয়ে যেয়ে সব কথা জানালো। ফিরে এল কম্পটন ওর মুখ সদাহাস্য।

—আমরা তোমাকে ভেতরে নিয়ে যাচ্ছি। সে বলল, আমাকে শ্রীমতীর জন্য আবার আসতে হবে। তেল নেওয়ার জন্য আমাকে বোধহয় অরুসায় একবার নামতে হবে।

—চায়ের কি হবে ?
— তুমি'ত জানো আমার ওসব না হলেও চলে ।
ছেলেরা চৌকিটা তুলে সবুজ তাঁবুর পাশে এনে রাখলো । পাতা আর আবর্জনায় ধরানো আগুন এখনো জ্বলছে । তাকে প্লেনের মধ্যে নিয়ে যাওয়া মুস্কিল । ওর পাটা সোজা ঢুকতে যেয়ে সিট এ লাগছে । অনেক কষ্টে চামড়ার জায়গায় তাকে বসানো হল । ক্যাপটেন মোটর চালিয়ে উঠে পড়ল । সেই পুরনো ঘর ঘর আওয়াজ । আস্তে আস্তে পাখা মেলে প্লেন ওপরে উঠে গেল । গাছের মাথা পেরিয়ে জঙ্গলের ওপর দিয়ে উড়তে থাকলো । নিচে দেখা যাচ্ছে সবুজ বনানী । বাঁশের ঝাড় তারপর পর্বত খাড়াই হয়ে নেমে গেছে এরপর সমতল ভূমি পার হয়ে গেলেই সামনে কালো পর্বতমালা ।
তারপর অরুসা যাওয়ার পরিবর্তে তারা বাঁদিকে ঘুরল । নিচে পিংক রঙের মেঘ । মাঠের ওপর বাতাসে উড়ে বেড়াচ্ছে । সে জানে দক্ষিণ দিক থেকে এখন বাতাস বইছে । হঠাৎ করেই বৃষ্টি শুরু হল । খুব ঘন হয়ে পড়ছে বৃষ্টি । দেখে মনে হচ্ছে তারা যেন জলপ্রপাতের মধ্য দিয়ে চলেছে । তারপর ওখান থেকে বেরিয়ে এসে মাথা ঘোরালো । সামনে বিরাট চওড়া প্রশস্ত অবিশ্বাস্য সাদা সূর্য ঠিক কিলিমনজেরোর মাথার ওপর উচুতে রয়েছে । সে বুঝতে পারলো যেখানে সে যেতে চেয়েছিলো এটা সে জায়গা ।
একটু পরে হায়নাটা কান্না থামিয়ে অদ্ভুত শব্দ করতে লাগলো, অনেকটা মানুষের কান্নার শব্দের মত । মহিলা অস্পষ্ট ভাবে সে শব্দ শুনতে পাচ্ছিল । সে তবু জেগে ওঠে নি । স্বপ্নে দেখতে পাচ্ছিলো সে যেন দূরের এক দ্বীপে বাড়িতে রাতে মেয়েকে সামনে নিয়ে বসে আছে । যেমনি করেই হোক তার পিতা সেখানে ছিল উপস্থিত । সে খুব রাগী । এই সময় হায়নাটা খুব জোরে আবার চীৎকার করে উঠলো । মহিলা প্রথমে একটু ঘাবড়ে গিয়েছিল । সে ফ্ল্যাশ লাইট ফেলে পাশের চৌকিতে তাকালো যেটা হ্যারি ঘুমনোর পর তারা ভেতরে নিয়ে গ্যাছে । মশারির ভেতর কোনক্রমে মহিলা দেখতে পেলো হ্যারির পাটি চৌকির পাশে ঝুলছে । তার পায়ের সমস্ত ব্যান্ডেজ খুলে গ্যাছে । মহিলা কোনমতেই আর তাকাতে পারলো না ।
—মলো, সে চীৎকার করে উঠলো, মলো ! মলো !
তারপর সে বলল, হ্যারি ! হ্যারি ! এরপর আরো জোরে চীৎকার করলো হ্যারি । ও হ্যারি !
কিন্তু কোন উত্তর নেই এবং দেখতেও পেল না যে সে নিশ্বাস নিচ্ছে । তাঁবুর বাইরে হায়নাটা সেই একই ভাবে অদ্ভুত আওয়াজ করে চলেছে । যে শব্দে সে জেগে উঠেছিল । কিন্তু কিছুতেই সে শুনতে পাচ্ছিল না তার কোন আওয়াজ নিজের হৃৎপিণ্ডের শব্দের জন্য ।

এ ক্লীন ওয়েল-লাইটেড প্লেস্

এখন অনেক রাত হয়েছে। সকলেই কাফে ছেড়ে চলে গেছে। শুধুমাত্র একজন বৃদ্ধ ছাড়া। সে বসে আছে গাছের পাতার ছায়ায়। দিনের বেলায় এই পথটা হয়ে থাকে ধুলোময়, কিন্তু রাতে একটু অন্যরকম শিশির পড়ে ধুলো কমে যায়। বৃদ্ধ গাছতলায় এই জায়গাটা খুব পছন্দ করেন কেননা তিনি কানে একটু কম শোনেন এবং রাতে এখানে বসে এর নিস্তব্ধতা অনুমান করতে পারেন। কাফের দুটো ছেলে বৃদ্ধকে মাঝে মাঝেই খেয়াল রাখছিল। বৃদ্ধ খুব ভাল মানুষ কিন্তু একটু বেশি ড্রিংক করা হয়ে গেলে তিনি পয়সা না দিয়ে চলে যাবেন।

—গত সপ্তাহে নিজেই আত্মহত্যা করতে গিয়েছিল। একটি ছেলে বলল।

—কেন ?

—তিনি খুব হতাশ হয়ে পড়েছিলেন।

—সে আবার কি ?

—কিছু না।

—কি করে বুঝলি ওটা কিছু না।

—ওর প্রচুর টাকা আছে।

পরিচারক ছেলে দুজন দেয়ালের ধার ঘেষানো একটি টেবিলে মুখোমুখি বসে আছে। ওদের সামনে একটা খোলা দরজা। ওখান থেকে ছাদের সব টেবিলগুলো দেখা যাচ্ছে। ফাঁকা পড়ে আছে। শুধু একটা টেবিল ছাড়া। সেখানে ছায়ায় বসে আছে সেই বৃদ্ধ। বাতাসে কাঁপছে গাছের পাতা। একটি মেয়ে এবং একজন সৈন্য রাস্তা দিয়ে হেঁটে চলেছে। রাস্তার আলোয় ওর কাধের পেতলের নাম্বার দেখা যাচ্ছে। মেয়েটির মাথায় কোন কিছু নেই। ত্রস্ত হয়ে হেঁটে চলেছে পেছন পেছন।

—শান্ত্রি ওকে তুলে নিয়ে যাবে, একজন পরিচারক বলল।
—যার পেছনে সে লেগে আছে তা যদি সে পেয়ে যায় তাতে কি এসে যাবে ?
—সে এখন রাস্তা ভাল পাবে। শান্ত্রি পেয়ে যাবে ওকে। তারা এই'ত পাঁচ মিনিট আগে গেছে এখান দিয়ে।
বৃদ্ধ লোকটি ছায়ায় বসে ডিসের ওপর চশমা নিয়ে লেপটে যাচ্ছিল। তরুণ পরিচারকটি দাঁড়াল কাছে এসে।
—আপনার আর কি চাই ?
বৃদ্ধ ওর দিকে তাকালো তারপর বলল, আর একটা ব্র্যাণ্ডি।
—এরপর আপনি বেহুঁষ হয়ে পড়বেন, পরিচারক উত্তর দিল। বৃদ্ধ চোখ তুলে তাকালো ওর দিকে। তারপর পরিচারক চলে এল ওখান থেকে।
—শালা বুড়ো সারা রাত থাকবে, সে এসে অন্য এক পরিচারককে বলল। আমার কি ভীষণ ঘুম পাচ্ছে। আজ বোধ হয় রাত তিনটের আগে কিছুতেই বিছানায় যেতে পারবো না। তার চেয়ে গত সপ্তাহে বুড়োর নিজেকে নিজের মেরে ফেলাই উচিত ছিল।
পরিচারক ছেলেটি এক বোতল ব্র্যাণ্ডি এবং সসার ভেতর থেকে বার করে এনে বুড়োর টেবিলের কাছে এসে দাঁড়াল। সসার রাখলো, টেবিলে গ্লাস ভর্তি করে ঢেলে দিল ব্র্যাণ্ডি।
—গত সপ্তাহে আপনি নিজেকে হত্যা করে ফেললে ভাল করতেন, সে কালা লোকটাকে বলল। বৃদ্ধ গ্লাসের দিকে হাত বাড়াত বাড়াতে বলল, আর একটু ঢালো। পরিচারক গ্লাসে এবার এমন ভাবে ঢাললো সেটা ভর্তি হয়ে কিছুটা উপচে পড়ে গেল নিচে।
—ধন্যবাদ, বৃদ্ধের জড়ানো উচ্চারণ। পরিচারক বোতল নিয়ে ফিরে এল কাফের মধ্যে। সে অন্যান্য আর সহকর্মীদের সঙ্গে এসে টেবিলে বসলো।
—বুড়ো এখন পুরো মাতাল, সে বলল।
—সে প্রতি রাতেই মাতাল হয়।
- সে কেন এভাবে নিজেকে মেরে ফেলছে ?
—আমি কি করে জানাবো ?
—কেনই বা এরকম করছে ?
—সে একবার গলায় দড়ি দিয়ে ঝুলতে গিয়েছিল।
—কে দড়ি কেটে নামিয়ে দিল ?
—ওর ভাইঝি।
—তারা এরকম করল কেন ?
—তার আত্মার ভয়ে।
- বুড়োর কত টাকা আছে ?

— প্রচুর।
—বুড়োর নিশ্চয়ই আশি বছর বয়স এখন।
—হয়তো আশিই হবে।
—বুড়োর এখন বাড়ি যাওয়া উচিত। রাত তিনটের আগে আমি কিছুতেই বিছানায় যেতে পারবো না। রাত তিনটের বিছানায় যাওয়ায় কোন মানে হয় ?
—বুড়ো অনেক সময় থাকে, তার মানে ও পছন্দ করে এরকম থাকা।
—বুড়ো একা। কিন্তু আমি'ত আর একা নই। আমার স্ত্রী আছে সে বিছানায় আমার জন্য অপেক্ষা করছে।
—বুড়োরও এক সময় স্ত্রী ছিলো।
—ওর কাছে এখন স্ত্রী কি সবই অর্থহীন।
—তা বলতে পারিস না। স্ত্রী থাকলে ও হয়তো ভালোও হতে পারতো।
—এখন বুড়োর ভাইঝি দেখা শোনা করে।
—জানি। তুই বলালি ও-ই'ত দড়ি কেটে দিয়েছিল।
—আমি বাবা অমন বুড়ো হতে চাই না। বুড়ো মানুষ মানেই বাজে জিনিস।
—সবসময় নয়। এই বুড়ো খুব পরিস্কার। একটু ও না টলে সে ড্রিংক করতে পারে। এখন 'ত সে পুরো মাতাল, কিন্তু তাকিয়ে দেখ।
—আমি তাকিয়ে দেখতে চাই না। দয়া করে উনি এখন বাড়ি যাক। যারা কাজ করে তাদের প্রতি তার একটুও শ্রদ্ধা নেই।
বৃদ্ধ চশমার মধ্য দিয়ে তাকালো। প্রথমে খোলা জায়গায় পরপর পরিচারকদের দিকে।
—অ্যাই আর একটা ব্র্যাণ্ডি, সে বলল। যে পরিচারক এতক্ষণ তাড়াতাড়ি করছিল সে এসে সামনে দাঁড়ালো।
—শেষ করে ফেলেছেন, সে বলল। তার কথা বলার ভঙ্গী এবং কায়দা একটু অন্য ধরণের। আজকে রাতে আর হবেনা। সবকিছু বন্ধ হয়ে গেছে।
—আর একবার, বৃদ্ধের অনুনয়।
—না, আর হবে না। পরিচারক তোয়ালে দিয়ে টেবিলের ধার মুছেতে মুছতে মাথা নাড়ল।
বৃদ্ধ উঠে দাঁড়ালো। পকেট থেকে চামড়ার পার্স বার করে মেটালো ড্রিংকের দাম। তারপর টেবিলের ওপর রাখলো পরিচারকের বখশিস্।
বৃদ্ধের চলে যাওয়ার দিকে তাকিয়ে রইল সে। রাস্তা দিয়ে হেঁটে চলেছে বৃদ্ধ। অপ্রকৃতিস্থ কিন্তু সম্পূর্ণ ভদ্রভাবে।
—কেন ওকে আরো কিছুক্ষণ ড্রিংক করতে দিলি না ? অন্য আর একজন পরিচারক জিজ্ঞেস করল। তারা এখন সব সাটার টেনে বন্ধ করে দিচ্ছে। এখনো আড়াইটা বাজে নি।

—আমি এখন বাড়ি যেয়ে শুতে চাই।

—আর কিছুক্ষণ থাকলে কি হত?

—আমার অনেক কিছু হত, ওর ব্যাপারে জানিনা।

—একরম বয়স্ক লোকের মত কথা বলছিস। বুড়ো'ত বোতল কিনে বাড়িতে বসেও খেতে পারতো।

—সে টা মোটেও এক ব্যাপার নয়।

—না, তা ঠিক। যে পরিচারকের স্ত্রী আছে সেও এ ব্যাপারে একমত। অবিবেচক নয়। সে শুধুমাত্র একটু তাড়াতাড়ি চায়।

—আর তোর? সময় বলে কিছুই নেই। একসময় গেলেই হল।

—আমাকে অপমান করতে চেষ্টা করছিস?

—না, হোমরে, শুধুমাত্র মজা করলাম।

—না, ব্যস্ত পরিচারক জানালো। সেই ওঠা থেকে ধাতু নির্মিত সাটার বন্ধ করা পর্যন্ত। আমার নিজের ওপর আস্থা আছে। আমি সবকিছুর ওপর আস্থাবান।

—তুই'ত এখন যুবক, আস্থা আছে এবং কাজও। বয়স্ক পরিচারক বলল, তোর এখন সবকিছুই আছে।

—আর তোর কি নেই?

—শুধু কাজ ছাড়া সবকিছু।

—আমার যা যা আছে তোরও তাই আছে।

—না। আমার কখনো নিজের ওপর আস্থা ছিল না এবং আমি এখন যুবকও নই।

—চল বাবা। বন্ধ করে চল এখন। বাজে বক বক করতে হবে না।

—আমি তাদেরই একজন যে শেষ পর্যন্ত কাফেতে থাকতে চায়। বয়স্ক পরিচারক বলল, যার সবকিছু থাকা সত্বেও বিছানায় যেতে চায় না। যার সবকিছুর সঙ্গে রাতের আলো।

—আমি কিন্তু ঘরে যেতে চাই এবং বিছানায়।

—আমাদের দুজনের ধরণ আলাদা। বয়স্ক পরিচারকের বক্তব্য। পোষাক ছেড়ে সে এখন বাড়ি যাওয়ার জন্য প্রস্তুত। এটা যৌবন কিংবা আস্থার প্রশ্ন নয় যদিও এসবই সুন্দর। প্রতি রাতে আমি কাফে বন্ধ করতে অনিচ্ছা দেখাই কেন জানিস, আবার কারো যদি রাতে কাফের প্রয়োজন হয়।

—হোমরে, তার জন্যও সমস্ত রাত মদের দোকান খোলা আছে।

—তুই কিছুই বুঝতে পারিস না। আমাদের এই কাফে পরিস্কার এবং সুন্দর। আলোকজ্জ্বল। মনোরম তার ওপর এখন আবার আছে গাছের পাতার ছায়া।

—শুভ রাত্রি। তরুণ পরিচারকটি জানালো।

—শুভ রাত্রি। অন্যজন উত্তর দিল। আলো নিভিয়ে দিল সব তারপর সে নিজের সঙ্গে নিজে শুরু করল কথা। আলোও চাই বটেই কিন্তু তার সঙ্গে সঙ্গে জায়গাটি

হওয়া প্রয়োজন পরিচ্ছন্ন এবং মনোরম। তোমার গান প্রয়োজন নেই। সত্যি'ত তুমি গান চাওনা। এমনকি ভদ্রভাবে কোন বারের সামনে দাঁড়ানোরও ক্ষমতা নেই। অথচ এই সময়ের জন্য তোমার যা যা থাকা প্রয়োজন তোমার সব আছে। তাহলে ভয় কিসের? না এ ভয়েরও কিছু না ভয়ঙ্কর ও না। সে ভালভাবেই জানে এ সমস্ত কিছু না। সবকিছুই কিছু না এবং একজন মানুষও কিছুনা। এটা সেই শুধুমাত্র আলো—যা একমাত্র প্রয়োজন এবং পরিচ্ছন্নতা ও নিয়মানুবর্তিতা। কেউ কেউ এর মধ্যেই বাস করে কিন্তু এ ব্যাপারে তার কোন চিন্তা করার নেই, সে শুধু জানে—এ সবই কিছু না, কিছু না এবং কিছু না। আমাদের কিছুনা'র অর্থ শিল্পের কিছুনা, কিছু না তোমার নাম তোমার রাজত্ব। আমরা এই কিছুনা'র শূন্যতায় বিলীন হয়ে যেতে চাই। দাও ফিরিয়ে আমাদের এই কিছু না, আমাদের প্রতিদিনের শূন্যতা। এই শূন্যতাই আমাদের দেয় শূন্য করে—যেহেতু আমরা নিজেরাও শূন্যকে করে তুলি শূন্য। শূন্য থেকেই আমাদের জন্ম—বিশাল শূন্যময়। এই সব কিছু নয় সব কিছুই শূণ্যময় তুমি শুধুই শূন্যতা। সে হাসলো এবং তারপর এসে দাঁড়ালো বারের ষ্টীম প্রেসার কফি মেশিনের সামনে।

—কি চাই? বারম্যানের প্রশ্ন।

—না ডা। কিছু না।

—ধ্যাৎ। বারম্যান মুখ ঘোরালো।

পরিচারক বলল, একটা ছোট্ট কাপ।

বারম্যান কাপ এগিয়ে দিল তাকে।

-ভীষণ উজ্জ্বল আলো এবং মনোরম কিন্তু সে তুলনায় বারটি ঝকঝকে নয়। পরিচারক জানালো।

বারম্যান ওর দিকে তাকালো কিন্তু কোন উত্তর করল না। এখন এত রাতে কথা বলার মত কোন ধৈর্য নেই।

—আর এক কাপ চাই? বারম্যান জিজ্ঞেস করলো।

- না, ধন্যবাদ। পরিচারক বেরিয়ে এল উত্তর দিয়ে। ওর এ ধরণের বার কিংবা দোকান অপছন্দ। পরিচ্ছন্ন আলোকজ্জ্বল কাফের ধরণই আলাদা। অন্য আর কোন কিছু না ভেবে সে এখন বাড়ি যাবে তার নিজের ঘরে। তারপর শুয়ে পড়বে বিছানায়। শেষে দিনের আলোয় সে ঘুমোবে। যাই হোক, সে মনে মনে বলল, সম্ভবত এসবই শুধু নিদ্রাহীনতা। অনেকেরই এ জাতীয় রোগ আছে।

টেন ইনডিয়ানস্

এটা জুলাই মাসের প্রথম সপ্তাহ। অনেক রাতে নিক শহর থেকে গাড়ি চালিয়ে ফিরছিল। ওর সঙ্গে ওয়াগনে ছিল জোয়ে গার্ণার এবং তার পরিবার। ন'জন ইন্ডিয়ান রাস্তার পাশে মত্ত অবস্থায় দাঁড়িয়েছিল। হ্যাঁ, নিকের মনে পড়েছে ওখানে ন'জনই ছিল। কারণ জোয়ে গার্ণার গাড়ি থেকে নেমে একজন ইন্ডিয়ানকে চাকার তলা থেকে সরিয়ে আনলো। সে প্রায় ঘুমিয়ে পড়েছিল। মুখ বালির মধ্যে গোঁজা। জোয়ে ওকে জঙ্গলের মধ্যে হিঁচড়ে রেখে এসে গাড়িতে উঠে বসলো।

—ওরা সবশুদ্ধ ন'জন, জোয়ে বলল, এখান থেকে শহরের ধার পর্যন্ত।

—সবাই ওরা ইন্ডিয়ান, শ্রীমতি গার্ণার জানতে চাইল।

নিক পেছনের সিটে বসে ছিল। ওর সঙ্গে ছিল গার্ণারের দুই ছেলে। পেছনের সিটে বসে ও ভাল করে খেয়াল করছিল বাবা কি ভাবে একজন ইন্ডিয়ানকে টেনে কোথায় রেখে এল।

—ওটা কি একটা বিড়াল ছিল? কার্ল জিজ্ঞেস করল।

– না,

—ওর প্যান্টের রঙের জন্য ওকে বিড়ালের মত লাগছিল।

—সব ইন্ডিয়ানরাই এক ধরণের প্যান্ট পরে।

—ওকে দেখে আমার কিন্তু সে রকম মনে হচ্ছিল না, ফ্র্যাংক বলল, ও রাস্তায় এমন ভাবে পড়েছিল, দেখে মনে হচ্ছিল ও বুঝি সাপ মারছে।

ওর উত্তরে জোয়ে গার্ণার বলল, মনে হয় আজে রাতে অনেক ইন্ডিয়ানই সাপ মারবে।

—সবাই ওরা ইন্ডিয়ান, শ্রীমতী গার্নার জানতে চাইলো।

তাদের গাড়ি চলছিল। এখান থেকে বাঁক নিয়েছে। হাইওয়ে থেকে রাস্তা ঘুরে উঠে গেছে পাহাড়ের ওপর। ওপর দিকে গাড়ি ওঠার সময় ঘোড়াদের টানতে বেশ কষ্ট হয়। সেজন্য ছেলেরা গাড়ি থেকে নেমে হাঁটতে শুরু করল। সম্পূর্ণ বালির পথ, নিক পাহাড়ের ওপরে এসে স্কুল বাড়ির পাশ থেকে ফিরে তাকালো নিচের দিকে। এরপর ওরা আবার গাড়িতে উঠে বসলো।

—ঐ বিস্তৃত পথে কিছু পাথর ছড়িয়ে রাখা উচিত ছিল, জোয়ে গার্নার বলল। জঙ্গলের মধ্য দিয়ে রাস্তা ধরে গাড়ি চলেছে। সামনের সিটে শ্রী এবং শ্রীমতী গার্নার পাশাপাশি বসেছে। দুই ছেলের মাঝখানে বসেছে নিক। আস্তে আস্তে রাস্তা পরিস্কার হয়ে আসছে।

—ঠিক এরকম জায়গায় পা ভোঁদর জাতীয় প্রাণীটিকে চাপা দিয়েছিল।

—আরো কিছু আগে।

—আমি'ত এ জায়গা আর ও জায়গায় কোন তফাৎ দেখিনা। জোয়ে মাথা না ঘুরিয়েই কথা গুলো বলল। ভোঁদর চাপা দেওয়ার পক্ষে দু জায়গাই সমান।

—আমি গত রাতে দুটো ভোঁদর দেখেছিলাম। নিক বলল।

—কোথায় ?

—নীচের হ্রদের কাছে। ওরা উপকূলে মরা মাছ খোঁজ করছিল।

—ওগুলো সম্ভবত ভল্লুক ছিল। কার্ল বলল।

—ওগুলো ভোঁদর। আমি মনে করি, আমি ভোঁদর চিনি।

—তুমি চিনতে পারো। কার্ল জানালো। তোমার একজন ইণ্ডিয়ান মেয়ে আছে।

—ঐ ভাবে কথা বলা বন্ধ করো কার্ল, শ্রীমতী গার্নার উত্তেজিত।

—ভাল, তারা এ সম্বন্ধে জানতে পারবে।

জোয়ে গার্নার হাসতে থাকে।

—তোমার হাসা বন্ধ করো, জোয়ে, শ্রীমতী চীৎকার করে জানালো কার্ল ওভাবে কথা বলুক আমি চাইনা।

—তোমার কি কোন ইণ্ডিয়ান মেয়ে আছে, নিক ? জোয়ে প্রশ্ন করলো।

—না।

ওর বাবা, আছে ফ্র্যাঙ্ক বলল, প্রুডেন্স মিচেল ওর মেয়ে।

—মোটে ও সে নয়।

—সে প্রতিদিন ওকে দেখতে যায়।

—আমি যাইনা। নিক অন্ধকারে দু ছেলের মাঝখানে বসেছিল, প্রুডেন্স মিচেলের সম্পর্কে কিছু বলতে পারার জন্য নিজের মনে দারুণ খুশি হচ্ছিল ও। সে আমার মেয়ে নয়, জানালো নিক।

—শোন ওর কথা। কার্ল বলল, আমি ওদের দুজনকে একসঙ্গে প্রতিদিন দেখি।

—কার্ল কোন মেয়ে পেতে পারে না। তার মা বলল,

কার্ল চুপ চাপ।
ফ্র্যাঙ্ক বলল, কোন মেয়ের সঙ্গ কার্লকে কখনোই ভাল লাগবে না।
—চুপ কর।
—ঠিক আছে কার্ল, জোয়ে গার্নার বলল, মেয়েরা কখনোই কোন মানুষকে পায়না। তুমি তোমার বাবাকে দেখ।
—হ্যাঁ, এখন'ও তুমি তাই বলবে, শ্রীমতী গার্নার জোয়ের আরো একটু কাছে এসে বলল ভাল, তোমার সময়ে তুমি প্রচুর মেয়ে পেয়েছিলে।
—আমার বেশ মনে আছে বাবা, তুমি একটি মেয়ের জন্য হন্যে হচ্ছিলে না?
—তোকে ও ব্যাপারে ভাবতে হবে না, জোয়ে বলল, তুমি বরং প্রুডিকে কি ভাবে রাখা যায় সে ব্যাপারে ভাবো, নিক।
তার স্ত্রী কানে কানে কি যেন বলল, তারপর হাসলো দুজনে।
—তোমরা হাসছো কেন? ফ্র্যাঙ্ক জিজ্ঞেস করল।
—কোন কিছু বলো না কিন্তু শ্রীমতী সাবধান করে দিল। জোয়ে আবার হাসতে থাকলো।
—নিক কি প্রুডেন্সকে পাবে, জোয়ে গার্নার বলল, আমার একটি ভাল মেয়ে আছে।
—হ্যা, ঠিক এই ভাবেই কথা বলতে হয়। শ্রীমতী গার্নার জানালো। ঘোড়াগুলো বালির মধ্যে খুব জোরে জোরে টানছে। জোয়ে চাবুক হাতে অন্ধকারে বেরিয়ে এল।
—হ্যাঁ, আরো জোরে, আরো জোর টান।
আস্তে আস্তে তারা দীর্ঘ পাহাড় অতিক্রম করল। গাড়িতে ঝাঁকুনি হচ্ছিল খুব। ফার্ম হাউসে এসে প্রত্যেকেই গাড়ি থেকে নামলো। শ্রীমতী গার্নার চাবি খুলে ঘরে ঢুকে ভেতর থেকে একটা বাতি নিয়ে বেরিয়ে এল। কার্ল এবং নিক গাড়ির সমস্ত মাল পত্র নিচে নামালো। ফ্র্যাঙ্ক গাড়ির সামনের সিটে এসে বসল গাড়িটা ঢুকিয়ে রাখার জন্য, ঘোড়াগুলোকে খুলে রাখতে হবে। নিক রান্না ঘরের দরজা খোলার জন্য এগিয়ে গেল। আর স্টোভ ধরিয়ে প্রস্তুত হলো শ্রীমতী গার্নার।
—বিদায়, শ্রীমতী গার্নার, নিক বলল। আমাকে নিয়ে আসার জন্য ধন্যবাদ।
—ও কথা বলতে হবে না, নিক।
—আমার খুব সুন্দর সময় কাটলো।
—তুমি আমাদের সঙ্গে থেকে খাবার খাবে না?
—আমি বরং যাই। নিশ্চয়ই বাবা আমার জন্য চিন্তা করছেন?
—আচ্ছা যাও তাহলে। যাওয়ার সময় কার্লকে একটু ওপরে পাঠিয়ে দিও না?
—আচ্ছা।
—শুভ রাত্রি, নিক।

—শুভ রাত্রি, শ্রীমতী গার্নার।

নিক ফার্মহাউস থেকে বেরিয়ে বাইরে এল। এখানে জোয়ে এবং ফ্র্যাঙ্ক দুধ দোয়াচ্ছিল।

—শুভ রাত্রি, নিক বলল, সন্ধের সময় কাটালাম।

—শুভ রাত্রি নিক, জোয়ে গার্নার জানালো, একি তুমি থাকছো না, আমাদের সঙ্গে খাবে না?

—না, আমি পারবো না। কার্লকে একবার বলে দেবেন ওর মা ডাকছে ওকে?

—ঠিক আছে। শুভ রাত্রি নিক।

নিকের খালি পা, ও তৃনভুমির মাঝখান দিয়ে আস্তে হেঁটে চলে গেল। সহজ মসৃণ পথে ভেজা শিশিরে ওর খালি পায় ঠান্ডা লাগছে। তৃণভুমির শেষে বেড়া। সেটা বেয়ে উঠে দড়ি বেয়ে নিচে নামলো সে। জলা কাদায় ওর পা ভিজে গেছে। তারপর শুকনো ঘাসের ওপর দিয়ে হাঁটতে লাগলো যতক্ষণ না পর্যন্ত ঘরের আলো দেখা যাচ্ছিল। ঘরের সামনে এসে জানালা দিয়ে তাকালো নিক। বাবা টেবিলে আলো জেবলে পড়ছে। দরজা খুলে ভিতরে ঢুকলো নিক।

—এই যে নিক, ওর বাবা ডাকলো, আজ কি ভাল দিন?

—আমি খুব মজায় ছিলাম, বাবা। এটা সেই আনন্দের ৪ঠা জুলাই।

—তোর নিশ্চয়ই খিদে পেয়েছে?

—তুমি বাজি ধর।

—তোর পায়ের জুতো কি করেছিস?

—গার্নারের গাড়ির ওয়াগানে ফেলে রেখে এসেছি।

—চল রান্না ঘরে চল।

নিকের বাবা আগে আগে বাতি নিয়ে চলল। রান্না ঘরে ঢুকে প্রথমে খুলল বরফের বাক্সের ঢাকনা। নিক ও এসে ঢুকল রান্না ঘরে বাবা প্লেটে করে এনে টেবিলে রাখলো একটুকরো ঠান্ডা মুরগীর মাংস এবং এক কাপ দুধ। তারপর বাতিটা নিকের সামনে টেবিলের ওপর রাখলো।

—এছাড়া কিছু মটর ও আছে। বাবা জানালো, খাবি?

—দারুণ মজা!

তার বাবা টেবিলের পাশে একটা চেয়ারে বসল। রান্নাঘরের দেয়ালে বিরাট ছায়া পড়েছে বাবার।

—বল গেম কে জিতলো?

—পেটোস্কি। পাঁচ তিনে।

বাবা বসে নিকের খাওয়া দেখছিল। খাওয়া শেষ হলে গ্লাস ভর্তি করে দিল দুধ। নিক দুধে চুমুক দিয়ে মুখ মুছল রুমালে এরপর বাবা তাক থেকে বড় একটুকরো কেক এনে নিককে দিল। হাকলবেরির কেক।

—তুমি সারাদিন কি করলে বাবা ?
—সকালে গিয়েছিলাম মাছ ধরতে।
—কি পেয়েছো ?
—একটা ছোট্ট মাছ।
বাবা বসে বসে নিকের কেক খাওয়া দেখতে লাগলো।
—বিকেলে কি করলে ? নিক জিজ্ঞেস করল আবার।
—রেড ইণ্ডিয়ানদের ক্যাম্পের পাশে হাঁটতে গিয়েছিলাম।
—কারো সঙ্গে দেখা হল সেখানে ?
—মাতাল হওয়ার জন্য সমস্ত রেড ইণ্ডিয়ানরা শহরে গেছে।
—কারো সঙ্গে দেখা হল না ?
—তোর বান্ধবী প্রুডির সঙ্গে দেখা হয়েছিল।
—কোথায় ছিল ও ?
—ফ্র্যাঙ্ক ওয়াসবার্নের সঙ্গে জঙ্গলে। আমি দৌড়ে গিয়েছিলাম ওদের দিকে। তারা সেখানে ছিল কিছুক্ষণ।
নিকের বাবার দৃষ্টি অন্যদিকে।
—ওরা কি করছিল ওখানে ?
—লক্ষ্য করার জন্য আমি'ত সেখানে থাকিনি।
—আমাকে বল, ওরা কি করছিলো।
—আমি জানিনা, বাবা বলল। আমি শুধু শুনতে পাচ্ছিলাম জঙ্গলের মধ্যে ওদের নড়াচড়ার শব্দ।
—তুমি কি করে বুঝলে সেটা ওদের করা শব্দ ?
—আমি ওদের দেখেছিলাম তাই।
আমার মনে হচ্ছিল তুমি বলেছিলে, তুমি ওদের দেখ নি।
—নিশ্চয়ই, আমি ওদের দেখেছি।
—ওর সঙ্গে কে ছিল বললে ? নিক জিজ্ঞেস করল।
-ফ্র্যাঙ্ক ওয়াসবার্ন।
—ওরা কি—ওরা কি—
—কি ওরা কি ?
—ওরা কি সুখি ?
—দেখে', তাই মনে হচ্ছিল।
বাবা চেয়ার ছেড়ে উঠে রান্নাঘরের বাইরে এসে আবার কিছুক্ষণের মধ্যে ফিরে এল। নিক এক দৃষ্টে তাকিয়ে আছে প্লেটের দিকে। ও বোধহয় কাঁদছিল।
—আর একটু কেক দি ? বাবা হাতে ছুড়ি নিয়ে জিজ্ঞেস করল।
—না, নিক উত্তর দিল।

—অন্তত আর একটুকরো খা।

—না, আর একটুকরোও না।

বাবা আস্তে আস্তে সমস্ত টেবিল পরিস্কার করে নিল।

—জঙ্গলের মধ্যে ওরা কোথায় ছিল? আবার নিকের প্রশ্ন।

—ক্যাম্পের পেছনে ওপরের দিকে। নিকের দৃষ্টি তখনো প্লেটের দিকে।

বাবা বলল, নিক এখন তুই শুতে যা।

—যাচ্ছি।

নিক নিজের ঘরে চলে এল তারপর জামাকাপড় খুলে বিছানায় উঠে এল। লিভিং রুমে বাবার পায়চারীর শব্দ শোনা যাচ্ছে। নিক বালিশে মুখ গুঁজে শুয়ে রইল।

—আমার হৃদয় ভেঙ্গে গেছে, সে ভাবলো। এই ভাবে চিন্তা করতে থাকলে সত্যি সত্যি হৃদয় ভেঙে যাবে।

কিছুক্ষণ পরে ও শুনতে পেল বাবা আলো নিভিয়ে নিজের ঘরে চলে গেল। বাইরে বাতাসের দোলা লাগছে গাছে। পর্দা দিয়ে ঠাণ্ডা হাওয়ার রেশ ঘরে আসছে। নিক অনেকক্ষণ পর্যন্ত বালিশে মুখ গুজে শুয়ে থাকতে থাকতে একসময় প্রুডেন্সের কথা চিন্তা করতে ভুলে গেল ও তারপর ঘুমিয়ে পড়ল। মাঝরাতে ওর ঘুম ভেঙে গেলে শুনতে পাচ্ছিল বাতাসের শব্দ হেমলক গাছে এসে লেগেছে; হ্রদে জলের ঢেউ এসে আছড়ে পড়ছে, এরপর আবার ও ঘুমিয়ে পড়ে। পরদিন ভোরে বাতাসের বেগ ছিল আরো বেশি, উপকূল ভূমিতে ঢেউ এর উদ্বেলতা তার হৃদয় ভেঙে গেছে—এই কথা মনে হওয়ার অনেক আগেই নিকের ঘুম ভেঙে গিয়েছিল।

যুদ্ধ সেখানে প্রায় সবসময়ই লেগে ছিল। কিন্তু আমরা সেখানে আর যাচ্ছিলাম না। মিলানের নিচু জায়গায় ছিল ঠান্ডা এবং অন্ধকার নেমে আসতো খুব তাড়াতাড়ি। বৈদ্যুতিক আলো এসেছিল অনেক পরে। জানালা দিয়ে রাস্তার দিকে তাকালে মনোরম লাগে। এখানে রাস্তার পাশে দোকানগুলোতে ঝুলতে থাকে বিভিন্ন ধরণের মজার মজার খেলনা। খ্যাঁকশিয়ালের চামড়ায় ঢোকানো তুষার, তার লেজ দুলছে হাওয়ায়। হরিন ঝুলে আছে শক্ত হয়ে, ভারি এবং শূন্য আর ছোট ছোট পাখি দুলছে বাতাসের দোলায়। হাওয়ায় তাদের পাখা ওলট পালট। এটা সেই ঠান্ডা জায়গা পর্বতচূড়া থেকে এখানে নেমে আসছে হাওয়া।

আমরা সকলেই প্রত্যেকদিন বিকেলে এসে হাজির হতাম হাসপাতালে। শহরের মাঝখান দিয়ে হাসপাতালে পৌঁছনোর ভিন্ন ভিন্ন পথ আছে। দুটো পথ খালের ধার দিয়ে কিন্তু পথ দুটো একটু দীর্ঘ। হাসপাতালে ঢোকার জন্য খালের ওপর আছে সেতু। এরকম তিনখানা সেতু পার হয়ে হাসপাতালে প্রবেশ করা যায়। এর মধ্যে একটির ওপর বসে একজন মহিলা ভাজা বাদাম বিক্রী করে। গরম গরম বাদাম পকেটে রাখার অনেকক্ষন পর পর্যন্তও গরম থাকে। এটি একটি ভীষণ পুরনো হাসপাতাল তবে খুব সুন্দর। তুমি গেট দিয়ে ঢুকে সোজা চলে এলে দেখতে পাবে এক প্রকান্ড চত্বর। সাধারণত অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার অনুষ্ঠান শুরু হয় এখান থেকেই। এই পুরনো হাসপাতালের পেছনে নতুন ইঁটের গাঁথা বাড়ী আছে আমরা প্রতিদিন বিকালে এখানে এসে হাজির হই। প্রত্যেকেই আমরা নম্র এবং আগ্রহান্বিত যে যার খবর জানার জন্য—কি ব্যাপার। বসি যন্ত্রের ওপর—উদ্দেশ্য প্রভেদ নিরূপন। ডাক্তার এসে যন্ত্রের কাছে দাঁড়ালো, যেখানে আমি বসে আছি। তারপর জানতে

চাইলো, যুদ্ধ শেষ হওয়ার আগে তুমি কি বেশি পছন্দ করতে? তোমার কি খেলাধুলোয় অভ্যাস আছে?
আমি উত্তর দিলাম: হ্যাঁ—ফুটবল।
—ভাল, সে বলল, তুমি তাহলে আগের চেয়েও ভাল ফুটবল খেলতে পারবে।
আমার হাঁটু বাঁকানো যাচ্ছে না। পাটা সোজা হয়ে থাকছে এবং সেই অবস্থায় মাটিতে পড়ছে। যন্ত্র দিয়ে তাকে বাঁকা করতে হবে এবং তাকে চালিয়ে চালিয়ে অভ্যেস করতে হবে তিন চাকা সাইকেল চালানোর মত করে। কিন্তু এখনো তা বাঁকানো যায় নি। বাঁকানো জায়গায় আসার আগেই যন্ত্রটি গড়িয়ে পড়ল। ডাক্তার বললেন, সব ঠিক আছে। তুমি ভাগ্যবান যুবক। তুমি আবার আগের মত ফুটবল খেলতে পারবে।
এরপরের যন্ত্রে ছিল মেজর যার শিশুর মত একটি ছোট হাত। ডাক্তার এসে যখন তার হাত পরীক্ষা করছিল, সে আমার দিকে তাকিয়ে চোখ মারলো। দুটো চামড়ার স্ট্রাপের মধ্যে হাতটা আর শক্ত আঙুল গুলোর ওপর চামড়ার মোড়ক। সে বলল, আমিও ফুটবল খেলতে পারবো ক্যাপ্টেন ডক্টর? সে একজন বড় অসিক্রীড়ক। সম্ভবত যুদ্ধের আগে ইটালীতে সে'ই ছিল সবচেয়ে বড় অসিক্রীড়ক।
ডাক্তার পেছনের দিকে ওর অফিস ঘর থেকে একটা ছবি নিয়ে এল। তার মধ্যেও দেখা যাচ্ছে একটা ছোট হাত একদম মেজরের হাতের মত। ঐ হাতটির জন্য ও যন্ত্রের সাহায্য নেওয়া হয়েছিল। ফল হয়েছে, একটু লম্বা হয়েছে হাতটা। ভাল হাতে ছবিটি নিয়ে মেজর খেয়াল করল যত্ন নিয়ে।
—ক্ষত? সে জানতে চাইলো।
—কারখানার দুর্ঘটনা। ডাক্তার উত্তর দিল।
—আশ্চর্য, সত্যি আশ্চর্য। মেজর বিস্মিত। ছবিটি ডাক্তারের হাতে ফিরিয়ে দিল।
—তোমার আত্মবিশ্বাস আছে?
—না। মেজর উত্তর দিল।
প্রত্যেকদিন আমার বয়সি আরো তিনজন ছেলে এখানে আসতো। তারা তিনজনই আসতো মিলান থেকে। একজন হতে চায় আইনজীবী, একজন আঁকিয়ে শিল্পী এবং অন্য জনের ইচ্ছে সৈনিক হওয়া। আমাদের এখানে যন্ত্রের কাজ শেষ হয়ে গেলে কখনো কখনো সবাই মিলে গিয়ে বসতাম কাফে কোভায়। মাপন যন্ত্রের খুব কাছেই ছিল এই কাফে। আমরা কমিউনিস্ট কোয়ার্টারের মধ্য দিয়ে যাতায়াত করতাম পথ সংক্ষেপ করার জন্য। পথ হাঁটতাম একসঙ্গে চারজন। মানুষজনরা আমাদের দেখে ঘৃণা করতো—কারণ আমরা অফিসার। মদের দোকানের মধ্য থেকে কেউ হয়তো চীৎকার করে ওঠে আমাদের দেখে, এ বাসো গ্লি উফিসিয়ালি। মাঝে মাঝে আমাদের সঙ্গে আর একজন ও পথ হাঁটতো। তার মুখটা সব সময় কালো সিল্কের রুমালে ঢাকা থাবতো। কারন ওর নাক ছিল না। তার মুখখানি নতুন করে ঠিক করতে

হবে। যে প্রস্তাবনার সীমান্তে যাওয়ার এক ঘন্টার মধ্যেই এই দুর্ঘটনা ঘটে। তাকে সীমান্তে যেতে হয়েছিল মিলিটারী অ্যাকাডেমির হয়ে। তারা তার মুখ ঠিক করতে চেষ্টা করেছিল কিন্তু এখন পর্যন্ত নাকটা ঠিক জায়গায় বসাতে পারেনি। সে দক্ষিণ আমেরিকার একটা ব্যাঙ্কে কাজ করেছিল। তাও আজ অনেকদিন হয়ে গেল, আমরা কিছুতেই বুঝতে পারছিলাম না এরপর কি ভাবে যাবে। আর আমরা যেটুকু বুঝতে পারছিলাম তা হচ্ছে যুদ্ধ লেগেই থাকবে, কিন্তু সেখানে আমরা কখনো যাচ্ছিনা।

আমরা সকলেই পেয়েছিলাম এক ধরণের মেডেল শুধুমাত্র কালো সিল্কে মুখ বাঁধা ছেলেটি ছাড়া। কেননা সে সীমান্তে থাকতে পারেনি বেশীক্ষণের জন্য। লম্বা ছেলেটি যে আইনজীবী হতে চায় সে অর্রিদিতির লেফটেনেন্ট, পেয়েছে তিনটে মেডেলে আর আমরা দুজন একটা করে। মৃত্যুর সঙ্গে যুদ্ধ করে ওকে বাঁচতে হয়েছিল অনেকক্ষন। সেইটুকু সময় সে ছিল বিচ্ছিন্ন। আমরাও বিচ্ছিন্ন ছিলাম অল্প সময় তাছাড়া আমারা প্রায় সব সময়ই একসঙ্গে, ঠিক এখন যে ভাবে প্রতিদিন বিকেলে হাসপাতালে মিলিত হচ্ছি। যদিও আমাদের কোভায় যাওয়া পথটা শহরের মধ্যে সবচেয়ে কঠিনতম পথ। অন্ধকার দিয়ে আমাদের হাঁটতে হয়। সেই সময় কেউ হয়তো আলো নিয়ে গান গাইতে গাইতে মদের দোকান থেকে বেরিয়ে আসে। কোথাও কোথাও রাস্তায় থাকে স্ত্রী পুরুষের অসম্ভব ভীড়। এই পথ অতিক্রম করার জন্য আমাদের কনুই ব্যবহার করতে হয় কখনো কখনো। আমরা বুঝতে পারি হয়তো একসঙ্গে হওয়ার জন্য কিছু ঘটলো। কিন্তু এও বলতে পারি যারা আমাদের ঠিক বুঝতে পারছে না।

আমরা নিজেরা সবাই বুঝতে পেরেছিলাম কোভা, এর প্রাচুর্য এবং উষ্ণতা সেখানে কোন সময়ই ছিল না আলোর উজ্জ্বলতা। শুধুমাত্র কয়েক ঘন্টা ধোয়ায় এবং শব্দে মুখরিত হয়ে থাকতো। টেবিলে সব সময় ভীড় জমিয়ে বসে থাকতো মেয়েরা দেয়ালে কাগজের ওপর আঁকা ছবি। এই মেয়েরা সবাই প্রায় দেশ প্রেমিক এবং আমি দেখেছি ইটালীর প্রায় সব কাফের মেয়েরাই দেশ প্রেমিক এবং আমার বিশ্বাস এখনো তারা তেমনি আসে।

প্রথমত ছেলেরা সবাই আমার মেডেলের ওপর নজর দিয়েছিল। তাদের প্রশ্ন এগুলো পাওয়ার জন্য আমাকে কি করতে হয়েছিল। আমি ওদের কাগজগুলো দেখালাম যার ওপর সুন্দর ভাষায় লেখা আছে। যেহেতু আমি একজন আমেরিকান তাই বোধহয় আমায় পুরস্কৃত করা হয়েছে। এরপর থেকেই লক্ষ্য করতে থাকি ওদের ব্যবহার আমার প্রতি যেন পাল্টে যাচ্ছে। যদিও বাইরে আমি ওদের বন্ধু। আমি বন্ধু ছিলাম ঠিকই কিন্তু কোন দিনই ওদের একজন হতে পারিনি কেননা ওদের সঙ্গে আমার মস্ত পার্থক্য দূরে সরিয়ে রেখেছে। তারা তাদের মেডেল পাওয়ার জন্য ভিন্নপথ অবলম্বন করতে একটু দ্বিধাগ্রস্ত হয়নি। এরপর আমি আহত হয়েছিলাম এটা সত্যি ; কিন্তু সবার ধারণা এটা একটা দুর্ঘটনা। তবু এ জন্য আমি নিজেকে

একটুও লজ্জিত বোধ করিনি, যদিও কখনো কখনো ককটেলের পর মনে মনে কল্পনা করতাম সব কিছু হয়ে যাওয়ার জন্য তখন তারা মেডেলের জন্য ব্যস্ত। অথচ তারপর একা একা শূন্য পথে ঠাণ্ডায় বাড়ির কাছে এসে রাস্তার আলোর নিচে দাঁড়িয়ে ভাবতাম, আমি কখনই এধরণের কাজ করতে পারবো না। আমি মরতে ভয় পাই। এবং রাতে মাঝে মাঝে একা বিছানায় মৃত্যুভয় অনুভব করি আর ভাবি এরপর আবার যখন সীমান্তে ফিরে যাবো তখন কেমন থাকবো।

তিনজন এখন ওদের মেডেল নিয়ে যেন শিকারী বাজ। আমি মোটে ও তা নই। আবার হতেও পারি তাদের কাছে যারা কখনো শিকারে যায় নি। তারা তিনজন এসব জানতো তাই আমরা ক্রমশ বিচ্ছিন্ন হতে থাকি। আমি থেকে যাই সেই ভাল ছেলের সঙ্গে যে প্রথম দিনই সীমান্তে আহত হয়েছিল। কেননা সে জানতেই পারেনি তাকে কি ভাবে ওখান থেকে চলে আসতে হয়েছিল। সুতরাং ওকে কোন সময়ই এসব মেনে নিতে হবে না এবং ও কোন সময়ই বাজের মত হবে না। তাই আমি ওকে ভালবাসতাম।

বিখ্যাত অসিক্রীড়ক সেই মেজরের দুঃসাহসিকতায় মোটেও বিশ্বাসী নয়। আমরা যন্ত্রের ওপর বসলে সে বসে বসে আমার ব্যাকরণ ঠিক করে দিয়ে যেতে লাগলো সে আমার ইটালী ভাষায় কথ বলার প্রশংশা করেছিল। আমরা দুজনে খুব সহজ-ভাবে সেই ভাষায় কথা বলতাম। একদিন আমি বলেছিলাম ইটালী আমার কাছে মনে হয় খুব সহজ ভাষা, তাই ওর প্রতি বিশেষভাবে কোন আগ্রহ দেখাই না। সব কিছুই খুব সহজ ভাবে বলা যায়। আচ্ছা? মেজর বলল, তাহলে তুমি ব্যাকরণের ব্যবহারটা ভাল করে দেখে নিচ্ছ না কেন? তাই ব্যাকরণ ঠিক করে কথা বলতে চেষ্টা করি। এরপর ক্রমেই মনে হতে থাকে ইটালী একটা কঠিন ভাষা। ব্যাকরণ ঠিক না করে ওর সঙ্গে কথা বলতে রীতিমত ভয় লাগতো আমার।

মেজর প্রতিদিন ঠিক সময় মত হাসপাতালে এসে হাজির হতেন। আমার এরকম একদিনের কথাও মনে পড়ে না। যেদিন তিনি হাসপাতালে আসেননি। যদিও আমি নিশ্চিত জানতাম ওর যন্ত্রের ওপর কোনরকমের বিশ্বাস ছিল না। তারপর একটা সময় এল যখন যন্ত্রের ওপর থেকে আমাদের ও বিশ্বাস চলে গেল। মেজর একদিন বলে উঠলেন এ সমস্তই বাজে ব্যাপার। সেই সময় যন্ত্রগুলোও ছিল নতুন এবং আমারই সেই প্রমান দিয়েছিলাম। এ সমস্তই বোকার মত ধারণা, সে বলল, একটি তত্ত্ব, অন্যের মত। আমার ব্যাকরণ শেখা হয়নি এবং সে জানিয়েছিল আমি নাকি এক অসম্ভব অবাস্তব, বোকার মত সে আমাকে নিয়ে ভাবছে। সে একজন ছোট মানুষ বসে আছে তার চেয়ারের ওপর। ডান হাত দিয়ে যন্ত্রকে ধাক্কা দিচ্ছে এবং তাকিয়ে আছে সোজা সামনের দেয়ালের দিকে যখন স্ট্রাপগুলো আঙ্গুল নিয়ে ধুপ ধুপ করে ওপর নিচে করছিল।

—আমি স্টেটসে চলে যাবো।

—তুমি কি বিবাহিত ?
—না, কিন্তু হবে।
—তুমি কি বোকা। সে বলল। ওকে দেখে মনে হচ্ছিল ভীষণ রেগে গেছে। একজন মানুষের কখনোই বিয়ে করা উচিত নয়।
—কেন, সিনোর ম্যাগিওর ?
—আমাকে সিনোর ম্যাগিওর বলে ডেকো না।
—কেন একজন মানুষের বিয়ে করা উচিত নয় ?
—সে বিয়ে করতে পারে না। সে বিয়ে করতে পারে না। ভীষণ ক্রুদ্ধ হয়ে সে জানালো। তাকে যদি সব কিছু হারাতে হয়, তাহলে এমন জায়গায় নিজেকে বসানো উচিত নয় যেখানে সে নিজেকে হারিয়ে ফেলবে। তাকে হারানোর জায়গায় নিশ্চয়ই বসানো উচিত নয়। তার এমন জিনিস খোঁজা উচিত যা তাকে হারাতে হবে না।
সে ভীষণ ক্রুদ্ধ হয়ে কথাগুলো জানালো। তার দৃষ্টি তখন ছিল সোজা সামনের দিকে।
—কিন্তু কেনই বা তাকে সবকিছু হারাতে হবে ?
—সে নিশ্চয়ই হারাবে, মেজর বলল। সে দেয়ালের দিকে তাকিয়েছিল। তারপর সে যন্ত্রের দিকে তাকালো, ঝাকুনি দিয়ে তার ছোট্ট হাতটা স্ট্র্যাপের মাঝখান থেকে বার করে নিয়ে এল তারপর নিজের উরুতে চাপড় মেরে চীৎকার করে বলল ; আমার সঙ্গে তর্ক করো না, সে নিশ্চয়ই হারাবে। এবার সে যন্ত্রচালককে কাছে ডেকে বলল যে এতক্ষণ যন্ত্র চালাচ্ছিল, এদিকে এস, এই বাজে বস্তুটিকে ঘুরিয়ে সরিয়ে নাও।
সে ওখান থেকে ফিরে অন্য ঘরে ঢুকলো হাল্কা চিকিৎসা এবং মালিশের জন্য। তারপর শুনলাম সে ডাক্তারের কাছে ফোন করার অনুমতি নিয়ে দরজাটা বন্ধ করে দিল। শেষে সে ফিরে এল এই ঘরে। আমি তখনো অন্য যন্ত্রের ওপর বসে ছিলাম। সে টুপিটা মাথায় পড়ে সোজা সামনে এসে দাঁড়িয়ে আমার কাঁধে হাত রাখলো।
—আমি ভীষণ দুঃখিত, তিনি এই কথা বলে আলতো করে আমার কাঁধে ভাল হাত নাড়লেন। আমার অতটা রূঢ় হওয়া উচিত হয়নি। আমার স্ত্রী সবে মারা গেছেন। আমাকে ক্ষমা করে দিও—
—ওহ্, আমার জন্য দুঃখ হল। আমিও ভীষণ দুঃখিত।
তিনি সেখানে দাঁড়িয়ে তার নিচের ঠোঁট কামড়াতে লাগলেন। এটা খুবই কঠিন ব্যাপার। সে বলল, আমি নিজে কখনোই কাজে ইস্তফা দিতে পারবো না।
তিনি আমার পাশে জানালা দিয়ে সোজা বাইরের দিকে তাকালেন। তারপর শুরু করলেন কাঁদতে। আমি সত্যি সত্যি কাজে ইস্তফা দিতে পারব না। এই কথা বলার পর তার গলা ধরে এল। তিনি শুধুই কাঁদতে লাগলেন। তার মাথা ওপর

দিকে, তাকিয়ে আছেন শূন্যে। তার দুগাল বেয়ে জল পড়ছে। কামড়াচ্ছেন ঠোঁট। তারপর যন্ত্রের পাশ দিয়ে হেঁটে দরজা দিয়ে বাইরে চলে গেলেন। ডাক্তার আমাকে বলছিলেন, তরুণী মেজরের স্ত্রী নিমোনিয়ায় মারা গিয়েছিল। ওর সঙ্গে তখনও বিয়ে হয়েছিল না কেননা মেজর যুদ্ধ থেকে অবসর নিয়ে বিয়ে করতে চেয়েছিলেন। তরুণী অসুস্থ হয়েছিল মাত্র কয়েকদিনের জন্য। কেউই ভাবতে পারেনি যে সে মারা যাবে। হঠাৎ দেখি মেজর তিনদিন হাসপাতালে আসছেন না। তারপর তিনি নির্দিষ্ট সময়ে এসে হাজির হলেন। ওর জামার হাতায় রয়েছে শোকের কালো চিহ্ন। যখন সে ফিরে এল, তখন দেওয়াল জুড়ে ছিল ফ্রেমে বাঁধানো ছবি। ভিন্ন ভিন্ন ধরণের ক্ষত যা আগে এবং পরে এই যন্ত্র দিয়ে সারানো হয়েছে। যন্ত্রের সামনে মেজর তিনটি ছবি ব্যবহার করতেন। ছবি তিনটিই ওর হাতের মত। সম্পূর্ণ সারিয়ে তোলা। আমি জানিনা ডাক্তার কোথা থেকে ছবিগুলো পেয়েছিলেন। আমি সব সময়েই জেনেছিলাম আমাদের জন্যই প্রথম এই যন্ত্রের ব্যবহার করা হচ্ছে। ছবিগুলো কোনভাবেই মেজরকে বিশেষ করে নাড়া দিতে পারলো না। সে শুধুমাত্র খোলা জানালা দিয়ে বাইরের দিকে তাকিয়ে রইল।

দি এণ্ড অফ সামথিং

প্রাচীনকালে হরটনের খাড়িকে বলা হত কাঠ চেড়াই এর শহর। হ্রদের তীরবর্তী এই কারখানা থেকে বড় করাতের শব্দ শোনেননি তেমন বোধহয় কেউই নেই। তারপর একটা বছর এল যখন চেড়াই করার জন্য কোন কাঠই রইল না। সেই সময় একদিন সেখানে এসে ভীড়লো পুরনো কতগুলো জাহাজ। বোঝাই করল সমস্ত চেড়াই করা কাঠ এনে। যা পড়েছিল করাত কলের মধ্যে। মস্ত বাড়িতে তৈরী এই কারখানাটি যন্ত্রপাতিতে স্বয়ংসম্পূর্ণ অথচ স্থানান্তরনের যোগ্য। তাই সহজেই যন্ত্রপাতিগুলো কারখানার একজনকে দিয়ে তুলে একটা জাহাজে ভরা হল। জাহাজটি ফাঁড়ি থেকে বেরিয়ে ভেসে চলল হ্রদের দিকে। এতে বোঝাই করা হয়েছে দুখানা বড় কড়াত, করাতের কাঠ বহনকারী অংশ যা কাঠকে ঘুরতে বাঁধা দেয়, গোল করাত, সব রোলার চাকা এবং বেল্ট। মালপত্র রাখা হয়েছে খোলের মধ্যে। এগুলো সব খোলা হোল্ড। ক্যানভাসে ঢাকা দড়ি দিয়ে বাঁধা আছে শক্ত করে। জাহাজের পালে লাগলো হাওয়া, এগিয়ে চলল হ্রদের মাঝখানে। সে বয়ে নিয়ে চলেছে কারখানায় তৈরী সবকিছু। একটি কারখানা এবং হরটনের খাড়ি। একটি শহর।

একতলা শোয়ার ঘর, কারখানার স্টোর, অফিস এবং বড় কারখানা সহ সবকিছু নিয়ে কাঠের গুড়োর ধুলোয় সেই খাড়ি উপকূল তৃণভূমি প্লাবিত হয়ে মরুভূমির রূপ পরিগ্রহ করল।

আরো কয়েক বছর সেখানে কারখানার আর কিছুই পড়ে রইল না। শুধুমাত্র ভিত্তি প্রস্তরের সাদা চুনা পাথরের অংশ দেখা যাচ্ছিল প্লাবণের দ্বিতীয় পর্যায়ে। সেই সময় নিক এবং মারজোরাই নৌকা বাইছিল তীরভূমির কাছ দিয়ে। তাদের নৌকা চলছিল একেবারে উপকূল ঘেসে হঠাৎ করে বালিয়াড়ির তলানি ধসে পড়ে যায় বার

ফুট নিচে জলের তলায় অন্ধকারে। তারা নৌকা নিয়ে চলেছে নির্দিষ্ট জায়গায় যেখানে পাওয়া যাবে সাতরঙা সামুদ্রিক মাছ।
—ঐ'ত আমাদের পুরনো সেই ধ্বংসাবশেষ, নিক, মারজোরাই উচ্ছসিত হয়ে উঠল।
—নিক নৌকা বাইছে, সবুজ বনের মধ্য সাদা স্তম্ভের দিকে তাকালো।
—হ্যাঁ ঐ তো, সে আঙুল দিয়ে দেখাল।
—তোমার মনে পড়ে কবে এখানে একটা মিল ছিল? মারজোরাই এর প্রশ্ন।
—আমার অল্প অল্প মনে পড়েছে, নিক উত্তর দিল।
—এটা অনেকটা দুর্গের চেয়েও বেশী মনে হচ্ছে। মারজোরাই জানালো। নিক কোন উত্তর করল না। তাদের নৌকা চলেছে তীরভূমি ছুঁয়ে ছুয়ে। তারপর একসময় কারখানাটি চলে গেল দৃষ্টের বাইরে। নিক খাড়ি অতিক্রম করল।
—ঐগুলো তেমন কিছু নয়, সে বলল।
—না, মারজোরই'র ও একই মত। তার দৃষ্টি শুধুই ছিপের দিকে, যতক্ষণ নৌকা চলছিল। এমন কি ওর কথা বলার ও সময় ছিল না। সে মাছ ধরতে ভালবাসে। এবং বিশেষ করে নিকের সঙ্গে।
নৌকার একদম কাছে, একটা বড় মাছ এসে হালটাকে আছড়ে পাছড়ে দিল। নিক কষ্ট করে নৌকা বাইছে। সে এক বৈঠা দিয়ে চালাচ্ছে, নৌকা ঘোরানোর জন্য। টোপ ফেলা সুতোটা নৌকার অনেক পেছনে জলে দুলছে সেখানে মাছটি খাচ্ছিল। যেই মাছটি পিছিয়ে জলের ওপরে উঠে এল অন্য ছোট ছোট মাছগুলি লাফিয়ে উঠল মন্ত্রের মত। জলের ওপর ছোট ছোট ফোটায় ছড়িয়ে গেল চারিদিক। আর একটা সামুদ্রিক মাছ জল ভেঙ্গে ছুটে এল। নৌকার অন্য ধারে গিয়ে শুরু করল খেতে।
—ওরা খাচ্ছে, মারজোরাই বলল।
—কিন্তু তবু ওরা এসে ঠেকবে না। নিক জানালো।
সে দুটো মাছের চারপাশে নৌকো নিয়ে বাইতে লাগলো তারপর নির্দিষ্ট একটা বিন্দুর দিকে। যতক্ষণ না নৌকাটা তীরে এসে পৌঁছল ততক্ষণ পর্যন্ত মারজোরাই সুতোটা গুটোতে লাগলো।
তারা দুজনে মিলে নৌকাটাকে তীরে তুলে নিল। এরপর নিক বালতি করে জল থেকে তুলে নিল কতগুলো জ্যান্ত মাছ। বালতিতে মাছগুলো সাঁতার কাটছে। নিক একসঙ্গে তিনটি মাছ তুলে ওদের মাথাগুলো কেটে ফেলে ছাল ছাড়িয়ে ফেলল। ততক্ষণে মারজোরই ও বালতি থেকে একটি মাছ তুলে তার মাথা ছিড়ে ছাল খুলে দেয়। নিক তার বান্ধবীর তোলা মাছটির দিকে তাকালো।
—তুমি বুকের কাছের পাখনাটা খুলবে না। সে বলল। টোপে ফেলার জন্য এরকমই ভালো কিন্তু বুকের কাছের পাখনা ভেতরে রাখাই উচিত।
সে লেজের দিক দিয়ে মাছগুলো বড়শিতে গাথলো। প্রত্যেকটি ছিপে দুটো করে বড়শি আছে। এবারে নৌকাটা জলে বাইতে লাগলো মারজোরই। দু-দাঁতে চেপে

ধরে রেখেছে সুতো। ওর দৃষ্টি নিকের দিকে। সে তীরে দাঁড়িয়ে আস্তে আস্তে সুতো ছাড়ছিল ছিপ থেকে।

—এই'ত ঠিক আছে। সে চীৎকার করে উঠলো।

—আমি এখন এটা ফেলবো! মারজোরই নৌকা থেকে জানালো। সুতোটা ও এখন হাতে ধরেছে।

—নিশ্চয়ই। এখন ছেড়ে দাও।

মারজোরই নৌকার বাইরে সুতোটা ছেড়ে দিল। আস্তে আস্তে টোপে গাথা সুতোটা জলের তলায় তলিয়ে যেতে লাগলো।

সে নৌকা নিয়ে ফিরে এসে দ্বিতীয় বার সুতো নিয়ে গিয়ে সেই একই ভাবে জলে ফেললো। প্রতেকবারই নিক ছিপের গোড়াটা বড় ভেসে থাকা কাঠের গুঁড়ির মাঝখানে এমন ভাবে রাখছিল যেন শক্ত করে ধরা থাকে। সামনে ছোট কাঠের টুকরো বসিয়ে ছিপটা কোনা করে রাখা হয়েছে। এরপর নিক ঝুলে পড়া সুতোটা ভাল করে হুইলে গুটিয়ে নিল যেন সুতোটা টান টান হয়ে থাকে। তাহলে মাছ এসে টোপ খাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বোঝা যাবে। ছিপে পরবে টান আর অমনি ক্লিক। মারজোরই এবার অতি সন্তর্পনে নৌকা বেয়ে এপারে চলে এল। জোরে শক্ত করে চাপ দিল বৈঠায়, নৌকা কিছুটা পাড়ে উঠে এসেছে। সঙ্গে সঙ্গে ভেঙে পড়ল ছোট ছোট ঢেউ। মারজোরই নৌকা থেকে নিচে নেমে এল তারপর নিক নৌকাটাকে টেনে একদম ওপরে নিয়ে এল।

– কি হয়েছে নিক? মারজোরাই জিজ্ঞেস করলো।

—আমি জানিনা। নিক বলল। আগুন জ্বালানোর জন্য সে কাঠ জোগাড় করছে। কাঠ জোগাড় করে তারা আগুন জ্বলালো। মারজোরাই নৌকায় ফিরে গিয়ে নিয়ে এল কম্বল। সন্ধ্যার বাতাস ধোঁয়াগুলো ঠেলে নিয়ে আসছে ওদের দিকে তাই মারজোরাই আগুন এবং হ্রদের মাঝে খুলে ধরল কম্বলটা। এরপর কম্বলের উপর বসল মারজোরই। আগুনের দিকে পেছন ফিরে বসে আছে ও। অপেক্ষা করছে নিকের জন্য। কিছুক্ষণ পর সে ফিরে এসে ওর পাশে কম্বলের ওপর বসল। ওদের পেছনে পড়ে আছে ঐ জায়গায় দ্বিতীয় শ্রেণীর কাঠ এবং ওদের সামনের দিকে হরটন গ্রীকের খাঁড়ির বাঁক। এখনও পুরোপুরি অন্ধকার হয়নি। আগুনের আলো জলে অনেক দূর পর্যন্ত বিস্তৃত। তারা অন্ধকার জলের ওপর স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছে স্টীলের ছিপ দুটো। ছিপের হুইলে আলো পড়ে চক চক করছে।

মারজোরাই রাতের খাওয়ার প্যাকেটটি খুললো।

—আমার একদম খেতে ইচ্ছে করছে না, নিক বললো।

—এই নিক অন্তত কিছুটা খাও।

—দাও।

দুজনেই খাচ্ছে, চুপচাপ। দৃষ্টি ছিপের দিকে আর জলের ওপর আগুনের আলোয়।

—দেখ আজ ঠিক চাঁদের আলো হবে, নিক কথা বলল। খাড়ির ওপরে পর্বত তার চূড়া আকাশ ছোঁয়া। পর্বতের পেছনে আলো দেখা যাচ্ছে। সে বুঝতে পারছে চাঁদ উঠে আসছে ওপরে।

—আমি জানি গো মশাই; মারজোরাই উৎফুল্ল।

—তুমি দেখছি সব জানো, নিক বলল।

—এই নিক দোহাই তোমার ও কথা বলো না। ও কথা বলো না নিক।

—আমাকে বলতেই হবে, নিক মুখ খুললো। তুমি কর সবকিছু জানো তাই। আর সেইখানেই যত গন্ডগোল। তুমি জানো তুমি কর। মারজোরাই কোন উত্তর দিল না।

—আমি তোমাকে সবকিছু শিখিয়েছি। তুমি জানো তুমি কর। যা তুমি জানোনা... সে যাক ?

—এই স...স, চুপ কর, মারজোরাই ইশারায় জানালো। ঐ দেখ চাঁদ উঠে আসছে। তারা কম্বলের ওপর দূরেত্ব বজায় রেখে বসে চাঁদের উদয় দেখতে লাগলো।

—ওসব আজে বাজে কথা বলো না, মারজোরাই জানালো, সত্যি কি ব্যাপার বলতো ?

—আমি জানি না।

—নিশ্চয়ই তুমি জানো।

—না, আমি জানি না।

—বেশ, চলে চলো।

নিক চাঁদের দিকে তাকিয়ে আছে। পাহাড়ের ওপর দিয়ে আস্তে আস্তে চাঁদ উঠে আসছে।

—এটা মোটেও মজার কথা নয়।

সে মারজোরাই'র দিকে তাকাতে ভয় পাচ্ছিল। তবু তাকালো। পেছন দিক করে বসে আছে সে। নিক তার পেছন দিকে তাকালো। না, এটা মোটেই মজার নয়। কিংবা ঐ রকম কিছু।

সে কোন উত্তর করল না। নিক বলে, অন্যান্য আর সবকিছুর মতই আমি অনুভব করি খারাপ। আমার ভেতরের মতো। আমি জানি না মারজ, আমি জানিনা কি বলবো।

সে তার পেছনদিকে তাকালো।

—ভালবাসা কি কোন মজার জিনিস নয় ? মারজোরাই বলল।

—না, নিক উত্তর দিল। মারজোরাই উঠে দাঁড়ালো। নিক বসে রইল সেখানেই। তার মাথা হাতের ওপর।

—আমি নৌকা নিয়ে যাচ্ছি, মারজোরাই ডাকলো ওকে, তুমি সেই জায়গায় হেঁটেই ফিরতে পারবে।

—ঠিক আছে নিক জানালো। নৌকাটা ঠেলে দেবো তোমার জন্য।

—না, সে প্রয়োজন হবে না, সে বলল। মারজোরাই নৌকা ভাসিয়ে চললো। চাঁদের আলো পড়েছে ওর নৌকার ওপর। নিক ফিরে এসে আগুনের পাশে কম্বলে মুখ গুজে শুয়ে পড়লো। সে শুয়ে শুয়ে মারজোরাই'র বৈঠা বাওয়ার শব্দ শুনতে পাচ্ছে। সে ঐখানে শুয়ে রইল অনেকক্ষণ পর্যন্ত। শুয়ে থাকতে থাকতে এক সময় সে শুনতে পেল বিলের আসার শব্দ। সে সমস্ত জঙ্গল পরিক্রমা করে আসছে। সে বুঝতে পারছে বিল এখন একদম আগুনের পাশে। বিল কিন্তু তাকে স্পর্শ করলো না।

—সে কি ঠিক মত যেতে পারবে? বিলের প্রশ্ন।

—হাঁ, নিশ্চয়ই। নিকের মুখ ঠিক সেই ভাবেই কম্বলে গোঁজা।

—তেমন কি কোন দৃশ্য তৈরী হয়েছিল?

—না, তেমন কিছু না।

—কেমন বুঝলে?

—ওহ! বিল তুমি যাও। কিছুক্ষণের জন্য তুমি চলে যাও।

বিল বাক্স থেকে একটা স্যান্ডউইচ বার করে মুখে দিল তারপর এগিয়ে গেল ছিপ দুটো দেখার জন্য।

দি ডকটর এণ্ড ডকটরস্ ওয়াইফ

ডিক বাউলটন এসেছে ইণ্ডিয়ান ক্যাম্প থেকে। সে এসেছে নিকের বাবার জন্য কাঠ কাটতে। তার সঙ্গে এসেছে তার ছেলে এডি এবং আর একজন ইণ্ডিয়ান তার নাম বিল্লি ট্যাবেশ্ব। তারা ভেতরে এসে ঢুকেছে জঙ্গলের পেছন দিকের ফটক দিয়ে। এডির সঙ্গে আছে লম্বা করাত। করাতটা ওর কাঁধের ওপর এমন ভাবে রয়েছে যে ও হাঁটলেই সেখান থেকে বেরুচ্ছে সংগীতের শব্দ। বিল্লি ট্যাবেশ্ব বয়ে এনেছে দুটো বড় হুক। আর ডিকের বগল দাবায় রয়েছে তিনটে কুড়োল।

সে ফটকটা ঘুরিয়ে বন্ধ করে দিল। অন্য সবাই এগিয়ে চলে গেল নিচের দিকে হ্রদের উপকূল যেখানে বালির মধ্যে ঢুকে রয়েছে কাঠের গুড়ি গুলো।

এগুলো ওপরের স্তুপিকৃত গুড়িগুলোর থেকে হারানো গুড়ি। ষ্টীমার ম্যাজিক ঠেলে ঠেলে গুড়িগুলো মিলের কাছে হ্রদে নিয়ে এসেছে। উপকূলে বেলাভূমিতে এখন রয়েছে সেগুলো, কিছুদিনের মধ্যে যদি কোন ব্যবস্থা না নেওয়া হয় তাহলে ম্যাজিকের খালাসীরা বাইচের নৌকা করে এসে গুড়িগুলো বাছবে এবং তারপর প্রত্যেকটি গুড়ির মধ্যে গজাল ঢুকিয়ে সে গুলো টেনে নিয়ে হ্রদের জলে আবার তৈরী করবে নতুন বুম। পড়ে থাকা গুড়িগুলোর জন্য কোন কাঠ চেড়াই ওয়ালকে আনা হবেনা কারণ ওগুলো খালাসীদের কোন পর্যায় আসবে না। ঐ গুড়িগুলো বেলাভূমিতে পড়ে পড়ে পচতে থাকবে।

নিকের বাবা জানে এধরণের ঘটনা ঘটে এখানে। সেজন্য সে ক্যাম্প থেকে একজন ইণ্ডিয়ানকে ভাড়া করে নিয়ে এসেছে। গুড়িগুলো করাত দিয়ে চেড়াই করে তারপর টুকরো করে কাটতে পারলে খোলা উনুনের জন্য ব্যবহার করা যাবে। ডিক বাউল-টন কুঠি অতিক্রম করে হাঁটতে হাঁটতে হ্রদের দিকে নামতে লাগলো। চারটে বড় বড়

বন্য গাছের গুঁড়ি প্রায় সম্পূর্ণই বালির মধ্যে ঢুকেছিল। এডি একটি গাছের সম্মুখের ডালে করাতের একদিকের হাতল আটকে ঝুলিয়ে দিল। ডিক কুড়োল তিনটে ছোট বন্দরে নামিয়ে রাখলো। সেই অর্ধশিক্ষিত হ্রদের চারপাশের বসবাস-কারী চাষীরা বিশ্বাস করেছিল ডিক নিশ্চয়ই সাদা মানুষ। ভীষণ অলস কিন্তু একবার কাজ শুরু করলে সে বড় শ্রমিক। সে পকেট থেকে তামাকের গোলা বার করে একটু ছিড়ে নিয়ে মুখে দেয় এবং তারপর এডি এবং বিল্লির সঙ্গে মজা করে কথা বলে।

তারা তাদের হুক দুটো একটা গুঁড়ির মধ্যে ঢুকিয়ে দিয়ে এমনভাবে টানতে থাকে যেন বালির মধ্যে কাঠের গুঁড়ি আটকে না থাকে। তাদের সমস্ত শক্তি দিয়ে হুকের দণ্ডের ওপর চাপ দেয়। কাঠের গুঁড়ি বালির ওপর গড়ান খায়। এরপর ডিক বাউলটন নিকের বাবার দিকে ঘুরে দাঁড়ায়।

—এই যে ডক, সে বলল, এইবার যে কাঠের গুঁড়িগুলো চুরি করেছ, খুব ভাল।

—ওই ভাবে কথা বলো না ডিক, ডাক্তার উত্তর দিল। এইগুলো সব ভেসে আসা কাঠ।

ভেজা বালির মধ্য থেকে এডি এবং বিল্লির গুঁড়িটা বার জলের দিকে গাড়িয়ে দিল।

—হেই ঠিক মাঝখানে রাখো, ডিক বাউলটন চিৎকার করে উঠল।

—ওর জন্য তুমি কি করছ? ডাক্তারের প্রশ্ন।

—জলে ধুয়ে ফেল। করাতে কাটার জন্য বালিগুলো সব পরিষ্কার করো। আমি দেখতে চাই এটা কার কাঠ। ডিক একনাগাড়ে বলল কথাগুলো। হ্রদের জলে কাঠ ধোয়া হয়ে গেলে এডি এবং বিল্লি ট্যাবেশ্ব ঠুকলো ওদের লম্বা হুকের দিকে। রোদের প্রচণ্ড তাপে ওরা ঘামছে। নিক বালিতে হাঁটু গেড়ে বসে কাঠের শেষ মাথায় হাতুড়ির দাগের চিহ্ন দেখতে চেষ্টা করল।

—এটার মালিক হোয়াইট এবং ম্যাকনেলি। সে বলে উঠে দাঁড়াল। ওর ট্রাউসারের হাঁটুতে লাগা বালিগুলো ঝেড়ে ফেললো হাত দিয়ে। ডাক্তারের অস্বস্তিকর অবস্থা।

—ডিক তাহলে এই কাঠে করাত চালিও না। খুব ছোট করে সে জানালো।

—ওরকম কথা বলতে হবে না ডক, ডিক বলল, এ সব অর্থহীন বলা। আমার ওসব দেখার দরকার নেই কার থেকে এই কাঠ চুরি করেছ। সে ব্যাপারে আমি নাক গলাতে চাই না।

—তুমি যদি মনে কর এগুলো চুরি করা কাঠ, তাহলে তোমার কিছু করার দরকার নেই। যন্ত্রপাতি নিয়ে ক্যাম্পে ফিরে যাও, ডাক্তার রেগে আগুন। ওর মুখ লাল দেখাচ্ছে।

—অতটা উত্তেজিত হওয়ার দরকার নেই ডক, ডিক বলল। মুখ থেকে তামাকের রস বার করে কাঠে মুছলো। কাঠের জলে পড়ে পিছলে গেল রস। তুমি জান এগুলো চুরি করা আমি যেমন করে থাকি। আমার কাছে এর কোন পার্থক্য নেই।

—ঠিক আছে। তোমার যদি ধারণা হয় কাঠগ্লো চুরি করা, তবে তোমার জিনিস-পত্র নিয়ে এখান থেকে চলে যাও।
—এখন, ডক—
—যন্ত্রপাতি নিয়ে বিদেয় হও।
—শোন, ডক।
—আবার যদি আমাকে ডক বলে ডাকো তাহলে চোখে দাঁতে ঘুষি মেরে নামিয়ে দেব গলার কাছে।
—ওহে না। তুমি পারবে না ডক।
ডিক বাউলটন ডাক্তারের দিকে তাকালো। ডিক একসময়ে বিরাট ছিল। সে নিজেই জানতো সে কত বড় ছিল। সে চায় মারামারি হোক। সে খুসী। এডি এবং বিল্লি ট্যাবেশ্ব হুকের দিকে ঝুঁকেছিল, তারা ডাক্তারের দিকে তাকালো। ডাক্তার নিচের ঠোঁট দিয়ে নিজের দাড়ি কামড়ে ডিক বাউলটনের দিকে তাকিয়েছিল। এরপর সে ঘুরে পাহাড়ের ওপরের দিকে হাঁটতে শুরু করল—ঘরের দিকে। পেছন দিক থেকে দেখেও তাকে বোঝা যাচ্ছিল সে কত রেগে আছে। পাহাড়ের ওপরে উঠে ঘরে ঢোকা পর্যন্ত তাকে লক্ষ্য করছিল ওরা।
ডিক মজা করে কিছু কথা বলল। হেসে দিল এডি কিন্তু বিল্লি গম্ভীর। সে ইংরিজী বোঝে না। সে ঘামাচ্ছে, সমস্তক্ষণ ধরে চলল চিৎকার আর চেঁচামেচি। সে ছিল মোটা তার গোঁফের কয়েকটি চুল নিয়ে তাকে চেয়ারম্যানের মত মনে হচ্ছে। সে হুক দুটো তুলে নিল। ডিক তুলে নিল কুড়োলগুলো এবং এডি গাছ থেকে তুলে নিল করাত। তারা হাঁটতে শুরু করল, ঘর অতিক্রম করে পেছনের গেট দিয়ে ঢুকলো জঙ্গলের ভেতর। ডিক দরজাটা খোলা রেখে দিল। বিল্লি ট্যাবশ্বে ফিরে যেয়ে আটকে দিয়ে এল সেটা। তারপর তারা জঙ্গলের মধ্য দিয়ে হেঁটে চলে গেল।
কুটিরের একটা ঘরে ডাক্তার বিছানায় বসে আছে। সে বসে বসে মেঝেতে স্তূপ করা মেডিক্যাল জার্নাল দেখছিল। জার্নালগুলো খোলা হয়নি। মোড়কে মোড়া। এগুলো দেখতে ওর মোটেও ভাল লাগছিল না।
—তুমি আর কাজে ফিরে যাচ্ছো না গো? ডাক্তারের স্ত্রী জিজ্ঞেস করলো। সে অন্ধকার ঘরে শুয়ে আছে।
— না!
— কিছু হয়েছে কি?
— ডিক বাউলটনের সঙ্গে আমার চেঁচামেচি হয়েছিল।
— ওহ। স্ত্রী জানালো। হেনরী তুমি নিশ্চয়ই তোমার ধৈর্য হারাও নি।
ডাক্তার বলল, না।
— মনে রেখো যে তার নিজের উৎসাহকে বড় বলে মনে করে তার দৌড় শহরাভি-মুখীন, ডাক্তারের স্ত্রীর উক্তি। সে একজন খ্রীষ্টিয়ান বৈজ্ঞানিক। তার বাইবেল,

সাইন্স এবং হেলথ ও ত্রৈমাসিক সংকলন অন্ধকার ঘরের টেবিলের ওপর।
এ কথায় স্বামী কোন উত্তর দিল না। সে এখন তার বিছানার ওপর বসে আছে, শটগান পরিষ্কার করছে। হলুদ মোটা শেলের ম্যাগাজিন ওর মধ্যে ঠেলে ঢোকাচ্ছে আবার বার করে ফেলছে সেগুলো। সেগুলো রয়েছে বিছানার ওপর ছড়ানো।
— হেনরি, স্ত্রী ডাকলো। তারপর কিছুক্ষণের জন্য থেমে আবার ডাকলো, হেনরি!
—বল, ডাক্তার বলল।
—তুমি বাউলটনকে উত্তেজিত করার মত কোন কথা বলনি'ত?
—না, ডাক্তার উত্তর দিল।
—কি নিয়ে এই গন্ডগোল হোল গো?
—তেমন কিছু নয়।
—আমাকে বল না হেনরি। আমার কাছে লুকোতে চেষ্টা করো না। কি গন্ড-গোল হয়েছিল।
—জান তো, ডিক আমার কাছে অনেক টাকায় ঋণী, ওর স্ত্রীকে নিমোনিয়া থেকে সারিয়ে তুলেছিলাম তাই এখন সে চিৎকার করে একটা বিশ্রী পরিবেশ সৃষ্টি করল যাতে তাকে আর কোন কাজ করতে না হয়।
ডাক্তারের স্ত্রী চুপচাপ। সে ন্যাকড়া দিয়ে সযত্নে বন্দুক পরিষ্কার করতে শুরু করল। তারপর শেষগুলো আবার ম্যাগাজিনের স্প্রিং-এর ওপর বসিয়ে দিল। সে বসে রইল বন্দুকটি হাঁটুর ওপর নিয়ে। এটা তার খুব প্রিয়। কিছুক্ষণ পরে শুনতে পেল তার স্ত্রীর গলা। অন্ধকার ঘর থেকে সে কথা বলছে।
—জানো আমি বিশ্বাসই করতে পারছি না যে এরকম একটা ব্যাপার নিয়ে কেউ কিছু করতে পারে।
—না? ডাক্তার উত্তর করলো।
— উদ্দেশ্যপ্রণোদিত হয়ে এ কাজ কেউ করতে পারে ভাবতেও পারি না। ডাক্তার উঠে দাঁড়ালো, বন্দুকটি রেখে দিল কোণায় আলনার পেছনে।
—তুমি কি বেরিয়ে যাচ্ছো গো? স্ত্রীর প্রশ্ন।
— ভাবছি, একটু হাঁটতে যাবো। ডাক্তার উত্তর দিল।
—নিককে দেখলে একটু পাঠিয়ে দিও না! ওকে বলো ওর মা ডাকছে। স্ত্রী জানালো।
ডাক্তার গাড়িবারান্দায় এসে দাঁড়ালো। ওর পেছনে পর্দার দরজাটা সশব্দে বন্ধ হয়ে গেল। দরজাটা বন্ধ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তার স্ত্রীর কথা ভেবে কষ্ট পাচ্ছিল।
—দুঃখিত, সে জানলার পাশে দাঁড়িয়ে স্ত্রীকে জানালো।
—এখন ঠিক আছে। স্ত্রী বলল।
দরজা খুলে গরমের মধ্যে সে হেমলক বনের পথ ধরে হাঁটতে শুরু করল। যদিও

গরমের দিন তবুও বনের মধ্যে ততটা গরম লাগছিল না। সে নিককে দেখতে গেল একটা গাছে হেলান দিয়ে বসে বই পড়ছে।
—তোমার মা তোমায় দেখা করতে বলেছে, ডাক্তার বলল।
—আমি তোমার সঙ্গে যেতে চাই। নিক জানালো।
বাবা ওর দিকে তাকালো।
—ঠিক আছে এস তাহলে, বাবা বলল, বইটা আমাকে দাও। পকেটে রেখে দিচ্ছি।
—আমি জানি বাবা কোথায় কালো কাঠ-বেড়ালি আছে। নিক উল্লসিত।
—ঠিক আছে। তার বাবা বলল, চল সেখানে যাওয়া যাক।

আউট অফ সীজ়ন

হোটেলের বাগান কুঁপিয়ে পেডুজ্জি চার লিয়ার আয় করেছে। সে বেশ মাতাল এখন। সে দেখতে পেল একজন তরুণ ভদ্রলোককে, কাছে এসে তিনি রহস্যজনকভাবে কথা বলছেন। কার নাকি এখনও খাওয়া হয়নি তবে লাঞ্চ শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই সে যাওয়ার জন্য প্রস্তুত।

খুব বাতাস বইছে আজ। তার মাঝে মাঝে আছে দু'এক ফোঁটা বৃষ্টি। আবার কখনো মেঘের ফাঁকে সূর্যকেও দেখা যাচ্ছে। ট্রাউট মাছ শিকার করার জন্য আজ এক অপূর্ব দিন।

তরুণ ভদ্রলোক হোটেল থেকে বেরিয়ে এসে তাকে ছিপের কথা জিজ্ঞেস করল। তার স্ত্রী কি ছিপ নিয়ে পেছনে আসছে? হ্যাঁ, পেডুজ্জি জানালো। চলুন আমরা ওর পেছন পেছন চলি। ভদ্রলোক হোটেলে ফিরে যেয়ে তার স্ত্রীকে জানিয়ে এল। এরপর পেডুজ্জি এবং সে নেমে এল রাস্তায়। ভদ্রলোকের স্ত্রীও আসছে, ওর হাতে রয়েছে ছিপ। পেডুজ্জির ভাল লাগছিল না ও অনেক পেছনে হাঁটছে দেখে। সিনোরা —সে ডাকলো। এগিয়ে আসুন। একসঙ্গে হাঁটি। পেডুজ্জির ইচ্ছে সবাই যেন এক সঙ্গে কোর্টিনার পথ ধরে হেঁটে যায়।

ভদ্রমহিলা তবু পেছিয়ে রইল। মুখ ভার করে এগিয়ে আসছে সে। পেডুজ্জি আবার চিৎকার করে উঠল, কি হোল আসুন তাড়াতাড়ি আমাদের সঙ্গে।

এরপর ভদ্রলোক পেছন দিকে মুখ করে স্ত্রীকে কিছু বলায় সে একটু জোরে পা চালাতে শুরু করল।

রাস্তা দিয়ে ওরা যখন হেটে যাচ্ছিল প্রত্যেককেই পেডুজ্জি জানাচ্ছিল সম্ভাষণ। কেউই কোন কথা বলছিল না। একটি ভিখারী ছাড়া। বৃদ্ধ জীর্ণ একমুখ দাড়ি নিয়ে ভিখারীটি ওর মাথার টুপি খুলে সম্ভাষণ জানিয়েছিল।

এরপর পেড়ুজ্জি একটা দোকানের সামনে এসে দাঁড়ালো যার জানালায় ভরা রয়েছে বোতল। ও ওর মিলিটারী কোটের পকেট থেকে একটা খালি বোতল বার করে বলল, অল্প একটু পানীয়। সিনোরার জন্য কিছু মারশালা। বোতল দেখিয়ে ও ভঙ্গী করলো, সিনোরার মারশালা পছন্দ ? ছোট্ট পানীয় ?

ভদ্রমহিলা মুখ গোমড়া করে বলে উঠলো, তোমাকে এর সঙ্গে যেতে হবে ?

—ও মত্ত অবস্থায়, এটা বুঝতে পারছো না ? ভদ্রলোক বোঝালেন।

ভদ্রলোক এগিয়ে এলেন সামনের দিকে। পেড়ুজ্জির কথা শোনার জন্য নয়। এ ত অন্য ধরনের ড্রিংক পেড়ুজ্জি মারশালা বলল কেন ? শেষপর্যন্ত ঠিক হল অন্য কিছু কেনা হবে। তরুণ ভদ্রলোক পকেট থেকে বার করে দিল দশ লিয়ারের এক নোট। পরের যে দোকান থেকে ড্রিংক কিনবে ঠিক করলো, সে দোকান তখনো বন্ধ। খুলবে নাকি দুটোর সময়। পেড়ুজ্জির খারাপ লাগছিল। সে ফিরে এসে বলল, যাকগে এ নিয়ে অত ভাবনার কিছু নেই। আমরা কনকরিডায় পেয়ে যাবো।

ওরা তিনজন পাশাপাশি হেঁটে কনকরিডায় পেঁছিল। একটা দোকানের সামনে দাঁড়িয়ে ভদ্রলোক পেড়ুজ্জির কাছ থেকে দশ লিয়ারের নোটটা ফেরত চাইল। তারপর দোকানের ভিতর ঢুকে বলল, তিনটে মারশালা। পেনট্রি কাউন্টারে বসেছিল একটি মেয়ে। সে জানতে চাইল, অর্থাৎ দুটো।

—না, ভদ্রলোক একটু উত্তেজিত। আমি তিনটে চাইছি।

—ওহ্। হেসে দিল মেয়েটি তারপর তিনটে গ্লাসে আলাদা আলাদা করে ঢেলে দিল ঘোলা জাতীয় পানীয়।

ভদ্রলোকের স্ত্রী বসেছিল কাছেই এক টেবিলে। ভদ্রলোক স্ত্রীর সামনে একটা গ্লাস রেখে বলল, খেয়ে দেখো, তোমার শরীর ভালই লাগবে। ভদ্রমহিলা গ্লাসের দিকে তাকিয়ে রইল।

কিন্তু পেড়ুজ্জি কোথায় ? ওকে খুঁজতে বেরিয়ে গেল ভদ্রলোক। কিন্তু ওকে পাওয়া গেল না। ফিরে এসে ভদ্রলোক জানালেন, কি জানি ও কোথায় গেছে। ভদ্রলোকের হাতে ধরা রয়েছে একটা গ্লাস।

ও হয়তো আরো বেশি চায়। ভদ্রমহিলা হাসলো।

তরুণ ভদ্রলোক দোকানীর কাছে জানতে চাইলো, কোয়াটার লিটারের দাম কত ?

—বিয়ান কো ? এক লিয়ার।

—না, মারশালা। এই দুটো এক জায়গায় ঢেলে কোয়াটার লিটার করে দাও। একটা বোতলে দিও, নিয়ে যাবো।

মেয়েটি বোতল খুঁজে আনতে গেল।

—টিনি তোমার এত বাজে লাগছে দেখে আমি সত্যি দুঃখিত। ভদ্রলোক স্ত্রীর দিকে তাকিয়ে বলল কথাগুলো। আমরা দুজনে কিন্তু একই জিনিস পাচ্ছি হয়তো ভিন্নভাবে।

—তাতে কিছু যায় আসে না। স্ত্রী জানালো, কোন কিছুতেই কোনকিছু যায় আসে না।
—তোমার কি খুব শীত করছে? ভদ্রলোক জিজ্ঞেস করল, তাহলে আর একটা সোয়েটার পরে নাও না?
—তিনটে পরেছি।
কিছুক্ষণ পর দোকানী মেয়েটি একটি ধূসর রঙের বোতল এনে তাতে মারশালা ঢেলে এগিয়ে দিল। তরুণ ভদ্রলোক পরিবর্তে মিটিয়ে দিল দাম পাঁচ লিয়ার। দোকান থেকে বেরিয়ে এসে দেখে পেড়ুজ্জি। সে অন্য ধারের চড়াই উতরাই পথ দিয়ে হাঁটছে। তার হাতে ধরা রয়েছে ছিপ।
—এদিকে আসুন না, সে ডাকলো। আমি ছিপগুলো বইবো। কেউ দেখলে কি আছে? কেউ আমাদের কোন ঝামেলা করবে না। কোরটিনায় আমায় কেউ ঘাটাবে না। আমি যে সৈন্য ছিলাম সবাই সে কথা জানে। তাই সবাই ভালবাসে আমাকে। আমি একসময় ব্যাঙ বিক্রী করতাম। যদি মাছ ধরতে মানা থাকে ত কি আছে? মোটেও কিছু না। কিছু না। কোন ভাবনা নেই। আমি বলছি বড় বড় ট্রট আছে সেখানে। প্রকাণ্ড।
তারা পাহাড়ের ওপর থেকে নিচের দিকে নেমে নদীর দিকে এগুচ্ছে। এখন সহর ওদের পেছনে। সূর্য নেমে গেছে। অল্প অল্প বৃষ্টি হচ্ছে এখন।
—ঐ যে। পেড়ুজ্জি আঙ্গুল তুলে দরজার সামনে একটা মেয়েকে দেখিয়ে বলল, আমার ডটার।
—ওর ডাক্তার? ভদ্রমহিলা জানতে চাইল। ওকি ওর ডাক্তারের কাছে আমাদের দেখাতে চায়?
ভদ্রলোক স্ত্রীর ভুল ভাঙিয়ে দেয়। ও বলল, ওর ডটার অর্থাৎ মেয়ে। পেড়ুজ্জি আঙুল দিয়ে দেখানোর সঙ্গে সঙ্গে মেয়েটি ঘরে ঢুকে গেল।
ওরা এখন নদীর ধার দিয়ে হাঁটছে। কিছুক্ষণ হাঁটার পর ভদ্রমহিলার নিশ্বাস হঠাৎ যেন আটকে এল। ওর পাজরায় ব্যথা করছে। পেড়ুজ্জি খুব তাড়াতাড়ি কথা বলছে। কখনো জার্মান ভাষায় কখনো ডি অ্যাম্পেনো ডাইলেক্টে। সে কিছুতেই বুঝতে পারছিলো না কোন ভাষায় কথা বলবে ঠিক ওরা দুজন বুঝতে পারবে। ভদ্রলোকের উত্তর শুনে সে ঠিক করলো টায়রোলার ভাষায় কথা বলবে এবং বললও তাই। কিন্তু ভদ্রলোক আর স্ত্রী কেউই ওর কথা বুঝল না।
—শহরের সবাই দেখলো আমরা ছিপ হাতে নিয়ে চলেছি। এতক্ষণে নিশ্চয়ই পুলিশ আমাদের পিছু নিয়েছে। আমাদের কোনমতেই আর এর মধ্যে থাকা উচিত নয়। তার মধ্যে আবার এই বুড়ো মাতালটাও আছে।
—তুমি নিশ্চয়ই ফিরেও যেতে পারবে না, স্ত্রী বললো কথাগুলো। তোমাকে এখন যেতেই হবে।

—কেন তুমি ফিরে যেতে পারবে না ? ফিরে চল টিনি।
—আমি তোমার সঙ্গে যেতে চাই না। যদি কোন কিছু ঘটে তাহলে ? হঠাৎ করেই তারা ঘুরে দাঁড়ালো। পেড়ুজ্জিও দাঁড়িয়ে পড়লো। হাওয়াতে ওর কোট উড়ছে। তরুণ ভদ্রলোক পেড়ুজ্জিকে ইটালিয়ান ভাষায় বলছে বলে জানতে পারলো এখনো আধ ঘন্টার পথ হাঁটতে বাকী। তাই সে স্ত্রীকে বলে, এটা একটা বাজে দিন। চল ফিরে যাই। এসব মজায় আমাদের যেয়ে কাজ নেই।
—ঠিক আছে, বলে অমনি ভদ্রমহিলা সবুজ ঘাসের ধার বেয়ে ওপরে উঠে যেতে লাগলো।
পেড়ুজ্জি একদম নদীর ধারে ছিল। ভদ্রমহিলার চলে যাওয়া খেয়ালই করতে পারে নি। ফিরে এসে তাকে দেখতে না পেয়ে খুবই দুঃখ পেল।
—উনি চলে গেলেন ?
—তুমি বললে এখনো আধ ঘন্টার পথ আছে ?
—তা ঠিকই। কিন্তু এখানেও মাছ ধরা যেতে পারে।
—সত্যি ?
—নিশ্চয়ই। এ জায়গাও ভাল।
তরুণ ভদ্রলোক নদীর ধারে বসে পড়ে ছিপ সুতো রীল সবকিছু ঠিক করতে লাগলো। মনে মনে একটা অস্বস্তি লাগছে। যে কোন মুহূর্তে এখানে শহরের লোক এসে হাজির হয়ে যেতে পারে। পাহাড়ের মাথার কোণা দিয়ে শহরের ঘরগুলোর মাথা দেখা যাচ্ছে। সে তার ছোট বাক্সটা খুলে প্রস্তুত হতে থাকলো।
—তোমার কাছে একটু সীসা আছে ?
—না।
—তোমার নিশ্চয়ই সীসা আছে, পেড়ুজ্জি চিৎকার করে উঠলো। তোমার নিশ্চয়ই ফাত্‌না আছে। ছোট ফাত্‌না। ঠিক এখানে থাকবে। বঁড়শির ওপরটায়। তা না হলে টোপ জলের ওপর ভাসতে থাকবে। তোমার নিশ্চয়ই আছে।
—তোমার আছে ?
—না। ভাল করে দুটো পকেট দেখে সে উত্তর করলো। আমার একদম নেই। তবে আমাদের পেতেই হবে।
—তা হলে আমরা মাছ ধরতে পারবো না। তরুণ ভদ্রলোক জানতে চাইলেন। সুতো গোটাতে শুরু করলো রীলে। আমরা কাল কিছু মাছ আর ফাত্‌না পাবো। পেড়ুজ্জির চোখের সামনে ওর দিনটা ভেঙ্গে খান খান হয়ে গেল। সে ভদ্রলোককে জানালো, আপনি বলেছিলেন আপনার সবকিছু আছে ?
তরুণ ভদ্রলোকের দৃষ্টি তুষারগলা স্রোতের দিকে। সে জলের দিকে তাকিয়ে বলল, আমি জানি, দুটোই আমরা কাল পাবো।
—কাল ক'টার সময় ?

—সাতটায়।

সূর্য ক্রমশ নেমে যাচ্ছে। অল্প অল্প গরম থাকার জন্য ভাল লাগছে। ভদ্রলোকের এখন বেশ লাগছে। কেননা সে আর এখন আইন ভঙ্গ করছে না। নদীর ধারে সে বোতল বার করে পেড়ুজ্জির দিকে এগিয়ে ধরল। পেড়ুজ্জি ফিরিয়ে দিল সেটা। ভদ্রলোক একটু খেয়ে ওর দিকে আবার ধরল। পেড়ুজ্জি সেই একই ভাবে ফিরিয়ে দিল বোতলটা। কি হোল? খাও, এটা তোমার সেই মারশালা। এরপর হঠাৎ করে পেড়ুজ্জি বোতলটা নিয়ে সম্পূর্ণ ওর গলায় ঢেলে দিল। যখন সে ড্রিংক করছিল সূর্য দেখা যাচ্ছিল। এক অদ্ভুত দৃশ্য। আর যাই হোক এদিনটা সত্যি উপভোগের দিন।

—ঠিক সাতটায় সেনটা কারে! সে তরুণ ভদ্রলোককে ডাকলো। সত্যি ড্রিংকটা অদ্ভুত ছিল। তার চোখে দুটো চক চক করছে। তারা দুজনে পাহাড়ের ওপর দিয়ে হেঁটে শহরের দিকে ফিরতে লাগলো। ভদ্রলোক চলেছে আগে আগে পেছনে পেড়ুজ্জি।

পেছন থেকে ডাকলো সে, শুনুন পাঁচ লিয়ার দিয়ে সাহায্য করবেন?

—আজকের জন্য শুধু?

—না, আজকের জন্য নয়। কালকের জন্য। আমি সবকিছুই রাখবো কালকের জন্য। পানে, সালামি, ফরমাগ্গিনও সব ভাল ভাল জিনিস আমাদের জন্য। শুধু আপনি আমি আর সিনোরা। মাছ ধরার জন্য চাড়। আমি একটু মারশালা খেতে পারি। এসব কিছু পাঁচ লিয়ারের মধ্যে। যদি আপনি পাঁচ লিয়ার সাহায্য করেন।

তরুণ ভদ্রলোক পকেট থেকে নোট বার করে দিলে পেড়ুজ্জি আনন্দে তাকে দুবার ধন্যবাদ জানালো। তারপর ভদ্রলোক ভাল করিয়ে স্মরণ করিয়ে দিল, কাল ঠিক সাতটায়।

—আমি নাও যেতে পারি। ব্যাগটা পকেটে রাখতে রাখতে জানালো ভদ্রলোক।

—কি? পেড়ুজ্জি বিস্মিত। আমি কাল সব কিছু নিয়ে যাচ্ছি? শুধু আপনি আমি এবং সিনোরা। আমরা তিনজন শুধু।

—আমি হয়তো যেতে পারবো না। তরুণ ভদ্রলোক আবার জানালো। সম্ভবত সম্ভব হবে না। আমাকে হোটেলের অফিসে সেই সময় ব্যস্ত থাকতে হবে।

সোলজারস হোম

কানসারের সুশৃঙ্খল কলেজ থেকে বেরিয়ে ক্রেব সোজা চলে গিয়েছিল যুদ্ধে। একটা ছবি আছে যার মধ্যে সেও আর অন্যান্য ভাইদের মত সবার সঙ্গে রয়েছে। প্রত্যেকেই প্রায় একই মাপের উঁচু কলার পরে আছে। সে ১৯১৭ সালে নৌ-বাহিনীতে নাম লিখিয়েছিল। তারপর থেকে সে ইউনাইটেড স্টেটসে ফিরে আসেনি যতদিন না পর্যন্ত সেকেণ্ড ডিভিশন রাইন থেকে ফিরে এসেছিল ১৯১৯ সালের গ্রীষ্মে।

অন্য আর একটি ছবি আছে সেখানে ওকে দেখা যায় ও রাইনের ওপর দাঁড়িয়ে আছে ওর সঙ্গে আছে দুজন জার্মান মেয়ে এবং একজন সৈন্য নায়ক। ক্রেব এবং নায়ককে তাদের পোষাক পরার জন্য খুব বড় দেখায়। জার্মান মেয়ে দুটো খুব সুন্দরী ছিল না। ছবিতে রাইন অনুপস্থিত।

যে সময়ে ক্রেব তার নিজের শহর ওকলাহোমায় ফিরে এল ততদিনে যুদ্ধ-প্রত্যাগতদের অভ্যর্থনা জানানো শেষ। সে ফিরে এসেছে অনেক অনেক পরে। শহরের সমস্ত মানুষ যুদ্ধ থেকে ফেরা সবাইকে অভ্যর্থনা জানিয়েছে। এদের মধ্যে অনেকেই বায়ু রোগে আক্রান্ত। এখন তারই বিক্রিয়া শুরু হয়েছে। ক্রেবের এত দেরি করে প্রত্যাগমন অনেকেরই অদ্ভুত লেগেছে। এক বছর পর যুদ্ধ থেমে যায়।

প্রথম প্রথম ক্রেব, যে জঙ্গলে ছিল সয়সুনস্, সেণ্ট মিহিয়েল কিংবা আরগনে আদৌ কারো সঙ্গেই যুদ্ধ নিয়ে কোন আলোচনা করেনি। পরে যখন সে বলা প্রয়োজন মনে করল তখনই কেউই শোনার জন্য আগ্রহী হলনা। কারণ তার শহর ততক্ষনে প্রচুর যুদ্ধের নৃশংস কাহিনী রোমাঞ্চকর গল্প শুনে ফেলেছে। ক্রেব মনে মনে ভাবলো যদি কাউকে সত্যি সত্যি কিছু শোনাতে হয় তাহলে মিথ্যা বলতে হবে। এরপর সে দুবার বলেও ফেলেছিল। তার ফল তাকে পেতে হয়েছিল - তার কথা বলা এবং যুদ্ধের বিপক্ষের প্রতিক্রিয়া। সবকিছুতেই যে তার অনীহা ছিল যুদ্ধ চলাকালীন সে ছবি

পরিষ্কার হয়ে ওঠে ওর মিথ্যা বলার জন্য। সে ক্রমশ এইভাবে চলতে চলতে এক সময় জীবনের মূল্যবোধ মানবিকতা সবকিছু হারিয়ে ফেলে।
এমনকি ওর মিথ্যা বলার মধ্যে তেমন কিছু বিশেষত্ব ছিল না। বিশেষ ভাবে আরোপিত কোন কিছু দিয়ে বোঝাতে চেষ্টা করত। যেমন অন্য কেউ দেখেছে, শুনেছে, কিংবা কিছু করেছে—হয়তো সব সৈন্যের কাছেই এ বিষয় পরিচিত ইত্যাদি। এছাড়া ওর মিথ্যা বলা বাজী খেলার ঘরেও তেমন ভাবে সাড়া ফেলতে পারেনি। জার্মান মেশিন গানাররা যারা ছিল মুক্ত তাদেরই বন্দী মেয়েদের কথা শুনে একটুও বিচলিত হয়নি।
এই ভাবে মিথ্যা বলতে বলতে ক্রেব একসময় তার সবকিছু হারিয়ে ফেলল।
এই সময় গ্রীষ্মের শেষাশেষি; সে ঘুমোতে যাচ্ছিল অনেক দেরি করে। তারপর ঘুম থেকে উঠে হেঁটে পেঁছিল শহরের পাঠাগারে বই আনার জন্য। দুপুরের খাওয়া সারতো বাড়িতে। এরপর গাড়িবারান্দায় বসে পড়তে শুরু করত সে যতক্ষণ না পর্যন্ত একঘেয়ে লাগে। শেষে সে হেঁটে চলে আসতো শহরে অন্ধকার ঠান্ডা জুয়া খেলার ঘরে। তখন এই ঘরে উত্তেজনার মুহূর্ত। জুয়া খেলা তার ভীষণ পছন্দ।
সন্ধ্যাবেলায় তার ক্ল্যারিওনেট বাজানো অভ্যাস। এরপর ভবঘুরের মত শহরে ঘুরে বেড়ানো। তারপর কিছুক্ষণ পড়া এবং শেষে বিছানা। তার ছোট দুবোনের কাছে সে এখনো একজন নায়ক। সে বিছানায় বসে ব্রেকফাস্ট খেতে চাইলে তার মা সেখানেই খাওয়ার পেঁছে দিয়ে যায়। মা মাঝে মাঝে সুযোগ পেলেই ওর বিছানার কাছে যুদ্ধের গল্প শুনতে চায়। কিন্তু তখন তার দৃষ্টি হয়ে থাকে উদাসময়। তার বাবা ছিলেন অপ্রতিশ্রুতিবান।
যুদ্ধে যাওয়ার আগে ক্রেবকে কখনোই গাড়ি চালাতে দেয়া হত না। বাবা কখনই তার আদেশ ছাড়া কেউ গাড়ি চালাক এটা চাইতেন না। সবসময়ই তিনি ব্যবসার জন্য গাড়িকে মজুত করে রাখতে চাইতেন। গাড়িটা দাঁড়িয়ে থাকতো ফার্স্ট ন্যাশানাল ব্যাঙ্কের বাড়ির সামনে। এই বাড়ির তৃতীয় তালায় ছিল বাবার অফিস। এখন যুদ্ধের শেষে, গাড়ি সেই রকমই আছে।
শহরের কোন কিছুই পরিবর্তন হয়নি শুধু সেই ছোট্ট মেয়ের দল ছাড়া। তারা এখন বড় হয়ে গেছে। কিন্তু তারা বাস করে অদ্ভুত এক জটিলতর জগতে। সব কিছু সরিয়ে এই জটিল জগতে ঢোকার মত মানসিকতা কোন ভাবেই ক্রেব পাচ্ছিল না। যদিও তার ওদের দিকে তাকাতে ভালই লাগে। ওদের মধ্যে অনেকেই দেখতে বেশ সুন্দরী ছিল। প্রত্যেকেরই মাথায় ছোট ছোট চুল। তাদের সবারই পরনে ছিল সোয়েটার এবং শার্ট। কোমরের নিচ থেকে শার্ট ছিল ডাচ রঙের। এটা ছিল এক ধরনের ডিজাইন। গাড়িবারান্দার নিচে বসে রাস্তার অন্যধার দিয়ে ওদের হেঁটে চলা দেখতে ওর ভীষণ ভাল লাগতো। গাছের ছায়া দিয়ে হেঁটে যাওয়ার

দৃশ্য ওকে অভিভূত করে দিত। রঙিন সোয়েটারের দৃশ্য দারুণ সুন্দর। সিল্কের মোজা এবং তাদের পায়ের জুতো অপূর্ব। তার সবচেয়ে বেশি পছন্দ ছিল মাথার ববকাট চুল এবং সুন্দর হাঁটার ধরন।

যখন সে শহরে তখন ওর কাছে তাদের আবেদন খুব বেশি করে বাজতো না। ওর ভীষণভাবে অপছন্দ যখন সে দেখতে পেত ওরা সবাই গ্রীক আইসক্রীম পার্লারে। ওর কাছে ভীষণ ভাবে জটিল। তাছাড়াও অন্য কিছু ছিল। অনেকটা অনিশ্চিত ভাবেই সে একটি মেয়েকে পেতে চায়। কিন্তু তার জন্য সে কোন কিছু কাজ করতে চায় না সে একজন মেয়েকে ভালবাসতে চায় ঠিকই কিন্তু তার জন্য তার অনেক সময় নষ্ট হোক – এটা মোটেও পছন্দ নয়। এর জন্য গোপন ষড়যন্ত্র কিংবা জটিলতায় প্রবেশ করাও তার অপছন্দ এবং কোন বিচারালয়ের শরণাপন্ন – কখনোই সম্ভব নয়। সে এর জন্য আর নতুন করে কোন মিথ্যা কথা বলতে পারবে না। এসব কোনমতেই তার কাছে সুখপ্রদ নয়।

সে কোনরকম ফলাফলের জন্য প্রত্যাশী ছিল না, কিংবা কোন কিছুর পরিণতির জন্য। কোনরকম পরিণতি ছাড়াই সে বেঁচে থাকতে চেয়েছিল। অন্যভাবে বলা যায় তার জীবনে আদৌ কোন মেয়ের প্রয়োজন নেই। সৈন্য জীবন তাঁকে এভাবেই শিক্ষা দেয়। তোমার একজন মেয়ে প্রয়োজন। —এরকম একটি ভাব দেখালো ঠিক আছে। প্রায় সকলেই এরকম করে থাকে। কিন্তু এটা মোটেও সত্য নয়। তোমার মোটেও কোন মেয়ের প্রয়োজন নেই – এটাই সবচেয়ে মজার বিষয়। প্রথমত একজন এমন একটি ভাব দেখায় যেন মেয়ে অর্থ তার কাছে কিছুই নয়, সে তাদের নিয়ে কিছু ভাবতে চায়না এবং স্পর্শ করতেও না। আবার অন্য একজনের কাছে মেয়ে অবশ্যম্ভাবী। তাদের সে সবসময়ের জন্য কাছে পেতে চায়। তাদের ছাড়া সে ঘুমোতে যেতে পারে না।

এ সবই মিথ্যে। সবদিক থেকেই এ সমস্ত মিথ্যে। তুমি যদি তাদের নিয়ে চিন্তা না কর তাহলে কোন সময়ই তোমার মেয়ে প্রয়োজন হবে না। এ সমস্তই সে শিক্ষা গ্রহণ করেছিল সে যখন সৈন্য ছিল। তারপর কোন একসময় একজনকে পায়। যখন খুব করেই মনে মনে একজনকে সে চেয়েছিল। এ নিয়ে তোমার কোন চিন্তা নেই। একসময় না একসময় সে এসে হাজির হবেই। সে সৈন্য থাকার সময় এ সমস্ত লিখেছিলো।

এখন সে একজন মেয়েকে পছন্দ করতে পারে যদি মেয়েটি তার কাছে আসে এবং কোন কথা না বলে। কিন্তু এখানে বাড়িতে এ সব কিছু গণ্ডগোলের। সে জানতো এ সবের মধ্যে দিয়ে আবার কখনোই যাওয়া নয়। এ জাতীয় গণ্ডগোল মোটেও কাম্য নয়। এ সমস্তই জার্মান অথবা ফ্রেঞ্চ মেয়েদের সম্পর্কে। এ সমস্ত অনেক সময়ই বলার নয়। তোমার মোটেও বেশি কথা বলা উচিত নয় এবং প্রয়োজনও নেই। খুবই সহজ ব্যাপার, তোমরা ছিলে বন্ধু। প্রথমে সে ফ্রান্স সম্বন্ধে ভাবতে শুরু

করে তারপর সে জার্মানি নিয়ে ভাবতে থাকে। এদের মধ্যে সে জার্মানিকেই বেশি পছন্দ করে। জার্মানি ছেড়ে সে চলে যেতে চায় না। সে বাড়িও আসতে চায় না। এখন যখন সে বাড়ি চলে এসেছে তাই সবসময়ে গাড়িবারান্দার সামনে বসে থাকে। রাস্তার অন্যপাশ দিয়ে যে মেয়েরা হেঁটে যায় তাদের দেখতে ওর খুব ভাল লাগে। ওদের দেখতে ফ্রান্স কিংবা জার্মানি মেয়েদের চেয়েও সুন্দরী। কিন্তু যে পৃথিবীতে ওরা বাস করছে সেটা ঠিক ওর বাস করার পৃথিবী নয়। ওদের ভারি সুন্দর গড়ন। এই গড়ন ওর পছন্দ। সে ওদের মধ্যে একজনকে পেতে চায়। এটা খুবই রোমাঞ্চকর। কিন্তু সে কোন কথার মধ্যে যাবে না। একজন খারাপভাবে তার কাছে আসুক এটা তার কাম্য নয়। যদিও সে সবাইকে দেখতে চায়। এটা নিশ্চয়ই ভাল নন। বিশেষ করে এখন যখন সবকিছুই আবার ভাল হতে চলেছে।

সে গাড়িবারান্দার নিচে বসে যুদ্ধের বই পড়ছে। এটা একটা ইতিহাস। এতদিনে সে যত বই পড়েছে তার মধ্যে এটা অন্যতম। তবে বইয়ের মধ্যে কয়েকটা মানচিত্র থাকলে ভাল হত। মনে মনে এই বইটাই মানচিত্র এবং তার বর্ণনা নিয়ে আবার পড়ার বাসনা রইল। যুদ্ধ সম্পর্কে সে নতুন অনেক কিছু শিখছে এখন। সে নিজেও একজন ভাল সৈন্য ছিল। সেটাই তাকে তফাৎ করে দিয়েছে।

একমাস বাড়ি থাকার পর একদিন সকালে মা ওর শোয়ার ঘরে এসে হাজির। এসে বসলেন ওর বিছানার ওপর। তারপর ওর শরীরে হাত বোলাতে বোলাতে বললেন গতরাতে আমি তোর বাবার সঙ্গে কথা বলছিলাম। রোজ সন্ধ্যায় তুই গাড়ি নিয়ে যা—এটা তারও মত।

—আচ্ছা? ক্রেব বলল, ওর ঘুম ঘুম জড়ানো চোখ। সত্যি, গাড়ি বাইরে নিয়ে যাবো?

—হ্যাঁ। তোর বাবা এ ব্যাপারটা কিছুদিন থেকেই ভাবছিলেন। সন্ধ্যায় তুই যখন ইচ্ছে গাড়ি নিয়ে যেতে পারবি। তবে গতরাতে বাবার সঙ্গে আমার কথা হয় এই নিয়ে।

—আমি বাজি ধরতে পারি, তুমি নিশ্চয়ই বাবাকে রাজি করিয়েছ, ক্রেব বলে।

—না, এটা সম্পূর্ণই তোর বাবার পরিকল্পনা। আমাদের মধ্যে শুধু আলোচনা হয়।

- তাই, তবে আমি বাজি ধরতে পারি। ক্রেব বাজি ধরে।

- হ্যারল্ড তুই এখন ব্রেকফাস্ট খেতে আসবি? মা বলেন।

—এই'ত জামা কাপড় পরেই আসছি। ক্রেব উত্তর দিল।

মা ঘর থেকে বেরিয়ে চলে গেলেন। ও যতক্ষণ দাড়ি কেটে জামা কাপড় পড়ে তৈরী হচ্ছিল নিচে থেকে আসছিল কিছু ভাজার শব্দ। তারপর নিচে এসে যখন খেতে বসল ওর বোন সামনে এসে দাঁড়াল।

—এই যে হের, সে বলল, ঘুমকাতুরে বুড়ো খোকা। ঘুম থেকে উঠে কিছু পেলে?

ক্রেব ওর দিকে তাকালো। বোনকে ভালবাসে ক্রেব। এই বোন ওর খুব প্রিয়।
—কাগজ পেয়েছ? সে জিজ্ঞেস করল।
বোন তাকে এগিয়ে দিল কানসার শহর সংস্করণ ষ্টার। সে সঙ্গে সঙ্গে ব্রাউন কাগজের মোড়ক খুলে খেলার পাতাটা খুলে ধরে। ভাজ করে জলপাত্রের পাশে এমন ভাবে রাখে যেন সে খেতে খেতে পড়তে পারে।
—হ্যারল্ড, মা রান্না ঘরের দরজায় দাঁড়িয়ে ডাকেন। কাগজটাকে ওভাবে মুড়িয়ে ফেলিস না। তাহলে তোর বাবা তার ষ্টার পড়তে পারবে না।
—না না আমি মুড়িয়ে দিচ্ছি না। ক্রেব বলল।
তার বোন পাশে এক টেবিলে বসে ওকে খেয়াল করতে থাকে।
—আজ বিকেলে আমাদের স্কুলে খেলা হবে, বোন বলল, আমি আজ বেস বল খেলবো।
—ভাল, ক্রেব জানালো, আচ্ছা পুরনো দলটা কেমন আছে?
—আমি অনেক ছেলের চেয়েই ভাল খেলতে পারি। আমি ওদের বলি অবশ্য তোমাদের কাছ থেকেই আমি খেলা শিখেছি। অন্যান্য মেয়েরা ততটা ভাল খেলে না।
—তাই নাকি? ক্রেব হাসে।
—আমি ওদের বলি তোমরা সবাই আমার বাবু। হের, তুমি আমার বাবু নও?
—বাজি ধরতে পারি।
—ভাই কি কখনো ভাইয়ের বাবু হতে পারে না? যেহেতু সে তোমার ভাই।
—আমি জানি না।
—তুমি নিশ্চয়ই জানো। হের, তুমি কি আমার বাবু হতে পারো না। যদি আমার বয়স বেশি হয় এবং তুমি যদি চাও।
—নিশ্চয়ই। তুমি এখন আমার মেয়ে।
—সত্যি আমি তোমার মেয়ে?
—নিশ্চয়ই।
—তুমি আমাকে ভালবাসো?
—আহ-হা।
—আমাকে সবসময় ভাল বাসবে?
—নিশ্চয়ই।
—তুমি কি এসে আমার খেলা দেখবে?
—হয়তো বা।
—ওহ্ হের, তুমি মোটেও ভালবাস না। তুমি যদি ভালবাসতে তাহলে নিশ্চয়ই আমার খেলা দেখতে আসতে।
মা রান্নাঘর থেকে বেরিয়ে এসে খাওয়ার ঘরে দাঁড়ালো। তার হাতে প্লেটে রয়েছে ডিম ভাজা এবং আটার রুটি।

—হেলেন, তুই এখন একটু যা। মা বললেন, হেরল্ডের সঙ্গে কয়েকটা কথা বলব। প্লেটটা টেবিলের ওপর রেখে ক্রেবের মুখোমুখি বসলেন তিনি।

—কয়েক মিনিটের জন্য কাগজটা নামা হেরল্ড।

ক্রেব কাগজটা নামালো এবং ভাঁজ করে রাখলো।

—এরপর কি করবি কিছু ঠিক করেছিস হেরল্ড? তার মা জানালেন।

—না। ক্রেবের ছোট্ট উত্তর।

—সেজন্য ভাবিস না এখনই সময় হয়ে গেছে। এর মধ্যে মা ওকে এ কথাগুলো বললেন না। কিন্তু তাকে খুবই চিন্তাগ্রস্ত দেখাচ্ছিল।

—আমি এ ব্যাপারে কিছু ভাবিনি এখনো। ক্রেব বলল।

—ঈশ্বর প্রত্যেকের জন্যই কিছু না কিছু কাজ রেখেছেন। ওর মা বললেন, তাঁর রাজত্বে কারো অলস থাকার কথা নয়।

—আমি তাঁর রাজত্বের কেউ নই, ক্রেব বলল।

—আমরা সবাই তাঁরই রাজত্বে বাস করছি।

ক্রেব হতবুদ্ধি হয়ে তাকিয়ে থাকে।

—আমার তোকে নিয়েই যত চিন্তা, হেরল্ড। তার মা বলতে থাকে, তোর মনের অবস্থা আমি বুঝতে পারি। বিশেষ করে পুরুষরা খুবই দুর্বল হয়। আমি তোর প্রিয় দাদুর সম্পর্কে জানি। আমার নিজের বাবা, আমাকে বুঝিয়েছিল…যুদ্ধ কাকে বলে এবং তোর জন্য প্রার্থনা জানিয়েছি। আমি তোর জন্য সমস্ত দিন ধরে প্রার্থনা জানিয়েছি, হেরল্ড।

ক্রেব এক নজরে তাকিয়ে রইল ওর প্লেটের দিকে।

মা আবার বলতে থাকেন, তোর বাবাও চিন্তিত। তার ধারণা তোর আর কোন উচ্চ আকাঙ্ক্ষা নেই। জীবনের কোন এক নির্দিষ্ট আশা। চ্যার্লি সিমনস্, ও'ত তোরই বয়সী। ভাল কাজ পেয়ে গেছে। বিয়ে করবে খুব শীগগিরই। অন্যান্য ছেলেরাও যে যার কাজ ঠিক করে ফেলছে।

ক্রেব কোন কথা বলে না।

—ঐ ভাবে তাকিয়ে থাকিস না, হেরল্ড। মা বলেন, তুই নিশ্চয়ই জানিস আমরা তোকে ভালবাসি। তোর ভালর জন্যই আমরা বলতে চাই তাতে যাই কেন দাঁড়াক না। তোর বাবা তোর স্বাধীনতায় একটু মাথা গলাতে চান না। তিনি মনে করেন তোকে এখন গাড়ি চালাতে দেওয়া উচিত। যদি গাড়ি চালিয়ে কোন সুন্দরী মেয়েকে নিয়ে যেতে চাস—কোন আপত্তি নেই। আমরা চাই তোর আনন্দ। কিন্তু তোকে কোন না কোন একটা কাজে যুক্ত হতে হবে নিশ্চয়ই। কোন একটা কাজ পেলেই হবে। তোর বাবার তাতে কোন কিছু বলার নেই। তাঁর কাছে সব কাজই সম্মানীয়। কিন্তু তোকে'ত কিছু একটা করতে হবে। তিনি আমাকে আজ সকালে তোর সঙ্গে কথা বলতে বলেছেন এবং তারপর তুই যেন ওঁর অফিসে যেয়ে দেখা

করিস।

—তোমর সব বলা শেষ ? ক্রেব জানতে চায়।

—হ্যাঁ। সোনা ছেলে, তুই তোর মাকে ভাল বাসিস না ?

—আমি কাউকেই ভালবাসি না। ক্রেবের গম্ভীর উত্তর।

এটা মোটেও ভাল কথা নয়। ওর এরকম কথা বলা উচিত হয় নি। খুবই একটা বাজে বলে ফেলেছে। ও শুধুমাত্র মাকে আঘাত করতে চেয়েছিল।

সে উঠে মার হাত দুটো ধরে ফেলে।

মা ওর মাথাটা বুকে ধরে হাউ হাউ করে কেঁদে দেন।

—আমি কিন্তু ওভাবে কিছু বলতে চাইনি, সে বলে। আমি শুধু কোনকিছুর ওপর রাগ করেছিলাম। আমি কখনই একথা বলতে চাইনি যে আমি তোমাকে ভাল বাসি না।

—তুমি আমাকে বিশ্বাস করছ না মা ?

মা মাথা দোলান।

—সত্যি, সত্যি বলছি মা, আমায় বিশ্বাস কর।

—আমি বিশ্বাস করি, হেরল্ড।

—আমি তোর মা, তিনি বলেন। তুই যখন ছোট্ট ছিলি আমার হৃদয়ের পাশে !

ক্রেব মার কথা শুনে যেন কেমন হয়ে যায়। চোখ দিয়ে জল বেরিয়ে আসতে চাইছে। ও বলে, আমি জানি মা। এখন থেকে তোমার জন্য ভাল ছেলে হতে চেষ্টা করব।

—তুই কি আমার সঙ্গে বসে প্রার্থনা জানাবি, হেরল্ড ? মা বললেন।

—এখন তুই প্রার্থনা কর, হেরল্ড।

—আমি পারছি না, ক্রেব জানালো।

—চেষ্টা কর, হেরল্ড।

—পারছি না।

—তুই কি চাস আমি তোর হয়ে প্রার্থনা করব ?

—হ্যাঁ।

তাই মা ওর হয়ে প্রার্থনা জানায়। এরপর উঠে দাঁড়িয়ে ক্রেব মাকে চুমু খেয়ে ঘরের বাইরে বেরিয়ে এল। সে মনে মনে ঠিক করল কোন ভাবেই যেন ওর জীবন জটিলতর না হয়। ইচ্ছে করলে এখনি ও কানসা শহরে যেয়ে একটা চাকরী পেয়ে যেতে পারে—মা ত তাই চায়। এরপব হয়তো বাকি থাকে আর একটি দৃশ্য। তা হচ্ছে যে, কখনই সে বাবার অফিসে যাবে না। সে ওটাকে যেমন করেই হোক হারাবে। খুব সহজ ভাবে জীবন কাটুক —এটাই ও চায়। সে সোজা চলে যাবে স্কুলে যেখানে ওর বোন হেলেন বেস্‌বল খেলছে।
